এর পূরবী* ওর বিভাস



শ্রীমন্ত সওদাগর

মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ : শুভ : ১লা বৈশাখ ১৩৬৭ সাল

প্রকাশক :
শ্রীসুনীল মণ্ডল

দাম তিন টাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রাকর :
শ্রীকার্তিক চন্দ্র ভুঁইয়া
গিরিশ প্রেস
১০।এ, সরকার লেন
কলিকাতা—৭

উৎসর্গ

শ্রীসমরেশ বসু

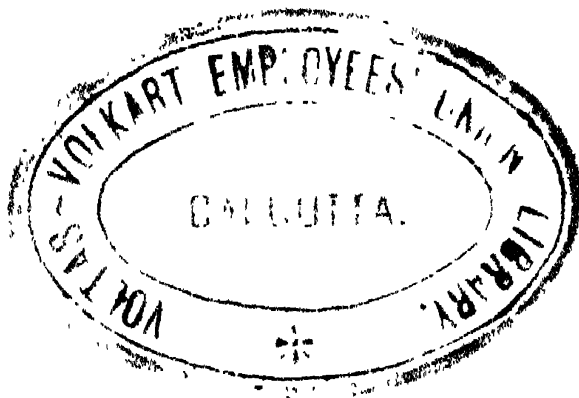
শ্রদ্ধাভাজনেষু—

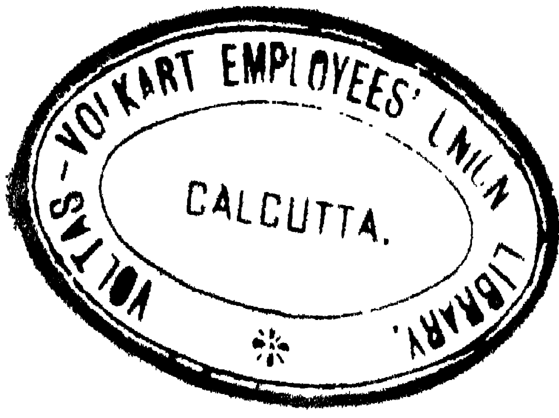
লেখকের অন্য বই :

শঙ্খবতী

সন্ধিলগ্ন




VOLTAS-VOLKART EMPLOYEES' LOAN LIBRARY.
CALCUTTA.



আলাপ

'সূর্যদেব, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক্—'

সেই ভোরে বিভাসের বাড়ি থেকে চলে আসতে আসতে মনে-মনে এই প্রার্থনাই আমি করেছিলাম।

বিভাস মুখোপাধ্যায়। বিখ্যাত সেতারী। আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। তিরিশ বছর আগে সে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, দীর্ঘকাল তার কোন উদ্দেশ আমরা পাইনি। কোথায় ছিল কি করে সেতার শিখেছে কিছুই না। দশ বছর আগে, যতদূর মনে হয়, বেতার-জগতে ওর নাম প্রথম দেখেছিলাম : কোলকাতা-বেতার কেন্দ্র থেকে উপর্যুপরি কয়েকটি প্রোগাম তার শোনা গিয়েছিল। আশান্বিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে সংগীত-জগতে এবার থেকে তাকে দেখতে পাব কিন্তু তারপর ফের সে না-পাত্তা হয়ে যায়। ছ,' বছর পরে সেদিন খবরের কাগজে দেখি তাকে সংগীত একাডেমী কর্তৃক পুরস্কৃত করা হয়েছে : হাতে সেই পুরস্কার নিয়ে বিভাস দাঁড়িয়ে রয়েছে হাসিমুখে এমন ভংগিমায় তার একটা ছবিও বেরিয়েছিল। পরে একটা সংবাদ পাঠ করে জানতে পারি সরকারী একটি শুভেচ্ছা মিশনের সঙ্গে সে চীন ও আমেরিকা ঘুরে এসেছে এবং দু জায়গাতেই প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। ওখান থেকে ফিরে উঠেছিল দিল্লীতে। সেই সময় অভিনন্দন জানিয়ে আমি তাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, পেয়েছিল কিনা জানিনা। তারপর মাসখানেক কেটেছে। গত দশদিন ধরে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞপন দেখছিলাম সেতারী বিভাস মুখোপাধ্যায় দূর প্রাচ্য ভ্রমণে বেরুবার

আগে তার দলবল নিয়ে কোলকাতায় কোন একটি প্রেক্ষাগৃহে তিনদিনের জন্য একটা প্রোগ্রামে নামছেন,—অগ্রিম টিকিট বিক্রি হচ্ছে। বরাবরই গান বাজনার ওপর আমার ঝোঁক আছে। তাছাড়া বিভাসের বাজনা শোনবার জন্যে আমি খুবই উদগ্রীব ছিলাম। একটা টিকিট কিনে ফেললাম শেষদিনের শেষ শোয়।

কতদিন পরে বিভাসকে দেখব! মনটা খুবই চঞ্চল ছিল। শো আরম্ভ হবার আগেই তার সঙ্গে দেখা করলাম। পরিচয় দিতে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরল। দেখলাম বিভাস বদলায়নি! মনটা খুশি হল। ফিরে এসে নিজের সীটে বসে নানা কথা ভাবছিলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠছিল ওর বিদ্যালয়ের দৃশ্যটি। গ্রামের মধুকুণ্ডু রেল স্টেশনে সে যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল তার সেই ছলোছলো মুখ আমি ভুলিনি। আমার মনে স্পষ্ট আঁকা আছে সেই চেহারা। দূর থেকে ট্রেনের আলো দেখা যাচ্ছিল। শীতের সন্ধ্যা কালো হয়ে নেমেছে তখন। বিভাসের গায়ে গলাবন্ধ সুতির একটা কোট আর পরনে আটহাতি ধুতি। আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে সে বলেছিল, শ্রীমন্ত চললুম রে। যদি বেঁচে থাকি আর বড় হতে পারি আবার দেখা হবে।'

আমি বললুম, 'নাই-বা গেলি বিভাস!'

বিভাসের চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, 'না রে আর ফেরা যায় না। তাছাড়া, কার কাছে ফিরব, তুই বল্?'

সত্যি সেদিন বিভাসের ফেরবার কোন উপায় ছিল না। কেউ জানতে পারেনি কতখানি দুঃখ বুকে চেপে রেখে একটি গ্রাম্য ছেলে ঘোর অনিশ্চিত ও অন্ধকারে ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়ে দিল। বিভাস ট্রেনে ওঠার পরও আমি বহুক্ষণ প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়েছিলাম, চোখের কোলে বিচ্ছেদ বেদনার অশ্রু জমে উঠেছিলো। ঝাপসা দেখেছিলাম চোখের সামনেটা। ট্রেনের পিছনের লাল বাতিটা ক্রমে ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল দূরে। বিভাস সেইদিন থেকেই অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল। আমাকেও পরে চাকরির জন্যে অন্যত্র চলে যেতে

হয়েছিল। বিভাসের কাকা অবশ্য অনুতপ্ত হয়ে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কিন্তু তাতে বিভাসের কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। আমরা বিভাসের মঙ্গল কামনা করেছি কিন্তু কোনদিন আর দেখা হয়নি।

সেই বিভাস! আজ দেশ জোড়া তার খ্যাতি। চীন এবং আমেরিকা ঘুরে এসে এবার সে আরো দূর-প্রাচ্যে চলেছে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে; যাবার আগে বিশেষ অনুরোধে কোলকাতায় এসেছে তিনদিনের প্রোগ্রাম নিয়ে। এত কাছে এসেছে বিভাস, আমার না এসে উপায় ছিল না।

শো আরম্ভ হয়ে গেল। তবলা-লহরার পর একটি মেয়ে অনেকক্ষণ নাচ দেখাল। তারপরে তবলচিকে সঙ্গে নিয়ে বিভাস এসে বসল মঞ্চে। সুন্দর সাজনো মঞ্চের মাঝখানে তাকে দেখে আমার চোখ যেন ফিরছিলো না। বিভাস বরাবরই রূপবান। ছেলেবেলায় তার স্বাস্থ্য আর মধুর স্বভাবের জন্যে সে সকলের প্রিয় ছিল। আমি হিসেব করে দেখছিলাম পনেরো বছর বয়সে সে গৃহ ত্যাগ করে থাকলে আজ তার বয়স পঁয়তাল্লিশ; কিন্তু আজও তার রূপ যেন সর্বাংগে ফেটে পড়ছে। কী উজ্জ্বল দুটো চোখ। অবিন্যস্ত একমাথা চুল, নিভাঁজ প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ম নাসা, পাতলা অধরোষ্ঠে এক দিব্য হাসি। ইলেক্‌ট্রিক আলোয় মীনে-করা দামী তরফদার সেতারখানা সে যখন হাতে নিয়ে বসল, মনে হল, সেতার যেন ওরই হাতে মানায়। দেখলাম সেতারখানা কপালে ঠেকিয়ে মনে মনে গুরুকে স্মরণ করল, তারপর শ্রোতাদের দিকে চেয়ে স্মিতমুখে অভিবাদন জানিয়ে সুরু করল বাজাতে। প্রেক্ষাগৃহের একটি আসনও শূন্য নেই। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে স্তব্ধ হয়ে বিভাসের বিস্ময়কর সেতার শুনছিলাম। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল আজ যদি বিভাসের কাকা বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি কত খুশি হতেন; একদিন বালক ভাইপোর হাত থেকে সেতার কেড়ে নিয়ে আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেলার বেদনায় অনুতপ্ত হয়ে নিশ্চয়ই বিভাসকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। কিন্তু বিভাসের কাকা আজ বেঁচে নেই; বিভাস সেই সেতার ভাঙ্গার দিনই বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল।

সকলেই মুগ্ধ হয়ে বিভাসের সেতার শুনছিল। হঠাৎ আমার পাশ থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'এ কী! আগের দুদিনও পূরবী শুনলাম আজকেও পূরবী। পূরবী ছাড়া আর কিছু বাজান-না নাকি?'

দেখলাম বিক্ষোভটা শুধু একা তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় 'এ-পাশ ও-পাশ থেকে ওই একই ধরণের গুঞ্জন উঠল। ক্রমে গুঞ্জনটা ছড়িয়ে গেল চারিদিকে বিভাস তন্ময় হয়ে বাজিয়ে যাচ্ছিল, সে মুখ তুলতেই পিছন দিক থেকে একটা কলরব ছুটে এল, 'পূরবী শুনতে চাইনা, অন্য কিছু বাজান—'

উদ্যোক্তাদের কয়েকজন তাড়াতাড়ি বিভাসের কাছে গিয়ে কানে কানে কী যেন বললেন। বিভাসকে বড় অসহায় হয়ে যেতে দেখলাম। আমার পাশের দু' একজন ভদ্রলোক উত্তেজিতস্বরে বললেন, 'এত বড় সেতারী, পূরবী ছাড়া আর কিছু বাজাবেন না এ হতেই পারে না। আমরা অন্য কিছু শুনতে চাই—'

উদ্যোক্তারা বিচলিতভাবে চিৎকার থামাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এক ভদ্রলোক স্টেজের সামনে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'পূরবী আমরা শুনব না, অন্য কিছু বাজান আপনি।'

বিভাস সেতারখানা হাতে নিয়ে উঠে পড়বার চেষ্টা করতেই চার-পাঁচজন তাকে ঘিরে ফেলল। একটা গোলমাল সুরু হল। বিভাস চলে যেতে চায়, ওঁরা তাকে ছাড়বে না। দেখলাম আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত। আতংকে এবং উত্তেজনায় আমিও তখন কি রকম হয়ে গিয়েছিলাম। সীট ছেড়ে স্টেজে উঠে বিভাসের একখানি হাত চেপে ধরে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'বিভাস, এ তুমি কী করছো। এতজন লোকের অনুরোধ তুমি রাখবে না?'

বিভাস চমকে, অসহায়ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল।

'অন্য রাগ বাজাও তুমি—'

আমি জোরের সঙ্গে বললাম। আমার ঝাঁকানি খেয়ে কিনা জানিনা বিভাস যেন সচেতন হল। স্টেজের ওপর থেকে লোকজনকে নেমে যেতে বললাম। বিভাস হাঁটু মুড়ে মাইকের সামনে বসল। আমি

নেমে আসেছিলাম, বিভাস ইঙ্গিতে বলল পাশে বসতে। বসলাম তার পাশটিতে। বিভাস সুরু করে দিল বাজাতে। শ্রোতারা শুনতে লাগল খুশি হয়ে।

ঘু' ঘণ্টা তন্ময় হয়ে বাজাল বিভাস অপূর্ব জমে উঠেছিল ওর বাজনা। এত কাছ থেকে ওর বাজনা শুনব, কোনদিন আশা করিনি খেয়াল ছিল না। কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল। রাত্রি এগারোটার পর ওর অনুষ্ঠান শেষ হল। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছিলাম লাষ্ট ট্রেণ ধরবার জন্যে। বিভাস বলল, 'এগারোটা বেজে গেছে ট্রেন কি পাবে?'

বললাম, 'দেখি।'

বিভাস মোটরে উঠছিল সেতার নিয়ে, বলল, 'তার চেয়ে বরং চলে এস আমার সঙ্গে। আজকের রাত্রিটা আমার অতিথি হয়ে থাকবে।'

খুশি হলুম। সত্যি ট্রেণটা পেতুম কিনা সন্দেহ ছিল। উঠে পড়লাম ওর মোটরে।

সারাটা রাস্তা বিভাস আমার সঙ্গে কোন কথা বলল না। আমার পাশে বসে পিছনে শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে রইল। আমিও কোন কথা বললাম না। বুঝতে পারছিলাম ওর মধ্যে এক প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে। মোটর তখন কলেজ ষ্ট্রীট পার হয়ে বউবাজারে পড়েছে। আরো কিছুদূরে যাবার পর একটা বাড়ির সামনে থামল। বিভাস বলল, 'এসো। এটা আমার দিদির বাড়ি। দিদি আজ বেঁচে নেই, আমিই এর মালিক—'

কোনোকালে শুনিনি বিভাসের কোন দিদি আছে। ওর মা নেই, বাবা নেই—অতি শৈশবেই সে তাদেরকে হারিয়েছে। মানুষ হয়েছিল কাকার কাছে। কাকা ঘোরতর ব্যবসায়ী। টাকা ছাড়া অন্য কিছু তিনি বুঝতেন না। বিভাস সংসারের কাজ করত, দোকানের কাজ করত, ইস্কুলে যেত, আর সময় পেলেই সেতার বাজাত। খুব ছোটবেলায় বিভাস একজন পাগল গুরু পেয়েছিল। একজন তান্ত্রিক, সেই তান্ত্রিক শ্মশানে বসে তন্ত্র সাধনা করত আর গভীর রাতে বাজাতো সেতার। শ্মশান ঘাট আমাদের বাড়ির পাশেই। বিভাস প্রায় প্রতি রাত্রেই

চুপি চুপি বিছানা থেকে উঠে শ্মশানে চলে যেত। তান্ত্রিক সাধু তাকে ডেকে পাশে-বসায়। ওর আগ্রহ দেখে বলে, শিখবি সেতার ?—আচ্ছা, আমি তোকে শেখাব।'

তারপর বিভাস রোজ রাত্রে তার কাছে যেত। তান্ত্রিকের পায়ের কাছে বসে সেতার শুনত। থমথমে অন্ধকার ছেয়ে থাকত চারিধারে' মড়ার খুলির ওপর দিয়ে বয়ে যেত নিশীথ রাতের হিসহিস বাতাস। শকুন ছানার কান্না আর প্রহরে প্রহরে শিয়ালের ডাকের মাঝখানে বসে তান্ত্রিক সাধু বাজাত সেতার, বিভাস তন্ময় হয়ে শুনত। তার গাঁজা সেজে দিত, পদসেবা করত। সুরের অপূর্ব মাদ-কতা নিয়ে ফিরে আসত ভোরবেলা। কিন্তু ব্যাপারটা চাপা থাকেনি। ওর কাকা কড়াসুরে ধমক দিলেন, তারপর খুব বকলেন, একদিন মারলেন। আমরা তাকে ভয় দেখালাম। পাড়ার মেয়ে মহল মাথায় হাত দিয়ে অনেক করে বোঝালেন, কিন্তু বিভাস যেন নিশি-পাওয়া ডাকের মতো রোজ মাঝরাত্রে উঠে তবু সেই শ্মশানে চলে যেত আর ভোর রাত্রে ফিরে এসে খুশি-খুশি মনে লেগে যেত কাকার দেওয়া সংসারের কাজে। এমনি করে বছরের পর বছর কেটেছে। বিভাসকে কিছুতেই শোধরানো যায়নি। সংসার আর দোকানের কাজকর্ম করে ইস্কুলেও যেতে হত তাকে। লেখাপড়াতেও তার একটা টান ছিল, ছাত্র হিসেবে নেহাত খারাপ ছিল না সে। আমরা দুজনে একসঙ্গে পড়তাম, আমি আর বিভাস।

ফার্ষ্ট ক্লাসে ওঠার পর একদিন দেখি ছাদের ওপর বসে বিভাস সেতার বাজাচ্ছে। শুনলাম, তান্ত্রিক সাধু এ-শ্মশান ছেড়ে কোথায় চলে গেছে, যাবার সময় সেতারখানা দিয়ে গেছে প্রিয় শিষ্য বিভাসকে। বিভাস মনের আনন্দে সেই সেতার বাজায়। টেষ্ট পরীক্ষার আগে ছাদে বসেই একদিন বিভাস সেতারখানা বাজাচ্ছিল; ওর কাকা বুঝি উপর্য্যুপরি কয়েকবার ডেকে সাড়া পাননি,—ওপরে উঠে এসে আরো খানিকটা অপেক্ষা করে হঠাৎ তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে বিভাসের হাত থেকে সেতারখানা কেড়ে নেন এবং কোন প্রকার বাধা পাবার আগেই সেটিকে আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেলেন। বিভাস স্তম্ভিত, হতবাক হয়ে যায়।

তার পরই সে অন্ধ উত্তেজনায় কাকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে' প্রচণ্ড বেগে এক ঘুসি বসিয়ে দেয়। অপ্রস্তুত ত্রৈলোক্যবাবু ঠিকরে গিয়ে কোনমতে ছাদের আলসে ধরে অনিবার্য পতন সামলে নিলেন, কিন্তু তাঁর মাথাটা কেটে যায়। বিভাস গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে থাকে। আমি খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখি সে হু হু করে কাঁদছে। তার হৃদয় যেন খান্ খান্ হয়ে গিয়েছিল। কাঁদতে কাঁদতে সে আমাকে বলেছিল, 'জানিস্, কাকা যদি আমাকে আছাড় মারত কিছু বলতুম না, কিন্তু সেতারখানা ভেঙে দিলেন কেন? এখন আমি কি করি! আমি কিছু বলতে পারিনি, শুধু তার অসহায় কান্না দেখেছিলাম। আবার উঠে দাঁড়ায় বিভাস, বলল, 'চললুম রে শ্রীমন্ত—'

চমকে গিয়ে বললাম, 'কোথায় যাবি?'

'তা জানিনা। কিন্তু এখানে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।'

ক্ষীণ বাধা দিলাম, 'তোর সামনে পরীক্ষা যে!'

বিভাস ম্লান হাসল, 'হাঁ—সত্যি আমার সামনে পরীক্ষা'

সেইদিনই মধুকুণ্ডু স্টেশনে তাকে বিদায় দিয়েছিলাম। অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে চলে গিয়েছিল সে। ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিরিশ বছর পরে এই দেখা। এর মধ্যে তার দিদি আসে কোথা থেকে? কোনোখানে তার কেউ নেই এই তো জানতাম! মোটর থেকে নেমে তার সঙ্গে ভেতরের দিকে চললাম। দুপাশে খানিকটা করে জমি, মাঝখানে পথ। পথটা শেষ হয়েছে গাড়িবারাণ্ডায় গিয়ে। নেহাত ছোট নয় বাড়িটা। দু'মহলা। গাড়ি বারাণ্ডার দুদিক দিয়ে দুটো সিঁড়ি উঠে গেছে। বিভাস আমাকে একদিককার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে গিয়ে একটা বড় ঘরের সামনে দাঁড় করাল। ফাঁকা ঘর, কিছু নেই। বিভাস বলল, 'জানো শ্রীমন্ত, এই ঘরে আমাদের মাইকেল বসত রাতের পর রাত। নাচ গান আর বাজনায় গমগম করত। এখনো কান পাতলে আমি অনেক কিছু শুনতে পাই—'

ও-ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল বিভাস। এ-ঘরও ফাঁকা, দেয়ালে শুধু একটা সারেংগী ঝুলছে। সেইদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে

বিভাস বলে, 'ওটা আমার ওস্তাদের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। এই ঘরে থাকতেন আমার ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁ সাহেব। গান আর বাজনায় সমান দক্ষ ছিলেন। আমার সেতার শিক্ষা এঁরই কাছে।' আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছিলাম। লম্বা টানা বারাণ্ডা—খানিকটা দূর গিয়ে বেঁকে অন্ত মহলে মিশেছে। পর পর কয়েকটা ঘর। ঠেলা দিয়ে আর একটা ঘর খুলতেই ঝট পট করে উড়ে গেল কয়েকটা চামচিকে। অনেক দিনের পরিত্যক্ত ঘর। ঝুল জমে আছে কড়িকাঠে বরগায়। কয়েকটি তবলার ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ল। বিভাস বলল, 'তবলচি বিঠলভাই থাকত এই ঘরে। অপূর্ব তবলা বাজাত। আমি তবলা শিখেছি এর কাছে। বিঠলভাই এখন কোথায় কেউ জানে না।' বাঁকের মুখে ফের একটা দরজা খুলে দিল বিভাস, মনে হল কোন নর্তকী থাকত এই ঘরে, ঘরের মেঝেতে এক জোড়া নুপূর পড়ে রয়েছে দেখলাম। 'এ-ঘরে থাকত তুঙ্গভদ্রা।' বিভাস বলল, নাচে-নাচে পাগল করে দিত মানুষকে। শেষ পরিণতিটা বড় করুণ।'

আমার সামনে যেন এক-একটা রহস্যলোকের দরজা খুলে যাচ্ছিল। আমি অবাক হয়ে ঘরের ভিতরগুলো লক্ষ্য করছিলাম আর বিভাসের কথা শুনছিলাম। বিভাস পার হয়ে যাচ্ছিল একটার পর একটা ঘর। ও-মহলে গিয়ে বিভাস খুলে দিল একটি কক্ষ। দেখলাম মেঝেতে ঢাকা দেওয়া রয়েছে একটা তানপুরা। আমি ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, বিভাস বলল, 'যেও না। এই আমার দিদি লোপামুদ্রার ঘর। নাচে আর গানে একদিন সারা কোলকাতা মাতিয়েছিলেন। আজ বেঁচে নেই। আমার সঙ্গে তাঁর যখন দেখা হয় তখন তাঁর পড়তি দিন, বয়স হয়ে গেছে। জানো শ্রীমন্ত, তাঁর সঙ্গে যদি আমার দেখা না হত কিংবা যদি তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে না আসতেন তাহলে আমি এতদিন কোথায় থাকতাম, কী করতাম, কিছুই জানিনা। অনেক বঞ্চনা সয়ে এই দিদিকে পাওয়া আমার এক পরম ভাগ্য। এসো, আমার ঘরে বসি।'

তার পরের ঘরটিতে ঢুকলাম। বিভাস বলল, 'এই ঘরে থাকতাম আমি। এইখান থেকেই আমি বি-এ পাশ করি আর এইখান থেকেই

আমার সংগীত-জীবনের সুরু। ওস্তাদ হামিদ হোসেনের কাছে সেতার শিখতাম, বিঠলভাইয়ের কাছে তবলা আর দিদির কাছ থেকে গান—'

অন্যান্য কক্ষগুলির চেয়ে এই কক্ষটি বেশ সাজানো—গোছানো। দেখলেই বোঝা যায় কখনো-কখনো কেউ এ ঘরে এসে বাস করে। সাজানো চেয়ার-টেবিল, খাট-বিছানা পাতা—কিছু কাপড় জামা। বিভাস একটা চেয়ার টেনে বসার সঙ্গে সঙ্গে একটি চাকরকে উঁকি মারতে দেখলাম। বুড়ো হয়ে গেছে, অনেক বয়স। বিভাস বলল, 'গঙ্গাধর, চট্ করে আমাদের দুজনের মতো কিছু খাবার নিয়ে এসো।' তারপর আমাকে বলল, 'কোলকাতায় এলে আমি এখানেই উঠি। এর সঙ্গে আমার বহু স্মৃতি বিজড়িত।'

খুব ক্লান্ত দেখছিলাম বিভাসকে। বললাম, 'কবে বেরুচ্ছ দূর-প্রাচ্য ভ্রমণে ?'

'শিগ্‌গীরই।' বুকটা চিতিয়ে বিভাস ক্লান্তি দূর করতে চাইল : 'তোমার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হয়ে গেল। মন খুলে দুটো কথা বলবার লোক পাইনা। বেশ টের পাচ্চি ভেতরে-ভেতরে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।'

বললাম, 'সে কি ! এত খ্যাতি—'

'খ্যাতি !'—বিভাস ক্লান্তভাবে চেয়ারে এলিয়ে দিল দেহ।

একটু হাসলো নিজের মনে। ঘরের দেয়ালে অনেকগুলো ছবি টাঙানো ছিল। আমি সেইগুলো তাকিয়ে দেখছিলাম। বললাম, 'বিভাস, এ-ছবিগুলো কার ?

চেয়ার থেকে উঠে বিভাস একে-একে ছবিগুলোর পরিচয় দিল। বৃদ্ধ একটি মুসলমান সেতার নিয়ে বসেছেন : ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁ। ডুগি-তবলা নিয়ে বাজাবার ভংগিতে বসে রয়েচে একজন ভীষণাকৃতি বিপুলকায় পুরুষ, বিঠলভাই : তার সামনে উদ্দামবেগে নাচছে একটি মেয়ে, তার গায়ের ওড়্না উড়ছে ঘাঘরা ঘুরছে, তুঙ্গভদ্রা। পরের ছবিটি একটি বর্ষিয়সী মহিলার, তানপুরা ছেড়ে গান গাইছেন লোপামুদ্রা। তারপরে বিভাসের কমবয়সী একটি ছবি। 'পনেরো বছর আগে

ছবিগুলো যা ছিল আজো ঠিক তাই আছে। ওই গঙ্গাধর বাড়িটার দেখাশোনা করে, নইলে এ-সব কিছুই থাকত না।'

আমি বললাম, 'তুমি বিয়ে করেছো?'

বিভাস বলল, 'না।'

'তোমার টেবিলে ওই ছবিটা কার?

আমি দেখতে পেয়েছিলাম বিভাস এবার যেখানে গিয়ে বসল তার সামনের টেবিলে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের ফ্রেমে-আঁটা ছবি। বিভাস বলল, 'এর কথা তোমাকে কিছুই বলা হয় নি, এরই নাম পূরবী। আর জানো, কোলকাতায় এলে পূরবী ছাড়া আমি আর-কিছুই বাজাতে পারি না সে কেবল এরই জন্যে। শুনে হয়তো তোমার আশ্চর্য লাগছে। কিন্তু সত্যিই এর জন্যে আমি অন্য কিছু বাজাতে পারি না। আমার জীবনে এই এক অভিশাপ। যে আমাকে একদিন অপমান করে তাড়িয়ে দিল তার জন্যে আমার সেতার এমন করে কেঁদে মরে কেন? কেন?'

বিভাসকে কিছু উত্তেজিত আর অস্থির দেখলাম। গঙ্গাধর হোটেল থেকে খাবার এনে দিল। বিভাস বলল, 'খাও।' ড্রয়ার টেনে সে একটা বোতল বার করল, 'কিছু মনে কোরো না। চলবে?' আমি ঘাড় নাড়লাম। বিভাস বলল, 'তাহলে তুমি খেয়ে নাও, আমি পরে খাচ্ছি।' আমি নিঃশব্দে খেতে লাগলাম। বিভাস চুমুক দিল গেলাসে। বুঝতে পারলাম ওর মনে বিরাট একটা ক্ষত জমে আছে। কিন্তু কি বলব। চুপ করে খাওয়া ছাড়া আমার গতি ছিল না।

বিভাস নিজেই বলল, 'অথচ ছাখো তার জ্বালা রয়ে গেল আমার সারাটি জীবনে। আর-কেউ না জানুক আমি তো জানি কেন আমি পাগলের মতো দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। স্বস্তি পাচ্ছি না কোথাও, তাই চলেছি ভারতবর্ষের বাইরে দূর প্রাচ্য ভ্রমণে। সেখানে গিয়েও তাকে ভুলতে পারব কিনা জানিনা কিন্তু টিঁকতে পারছি না এখানে। ভোলা বুঝি যায় না। এই কোলকাতা আমাকে অনেক শিক্ষা দিল। এখানে আমি আসতে চাইনা, আসতে চাইও নি, কিন্তু মজা ছাখো

এখানে এলেই আমার মাথায় কী-যেন ভর্ করে, হাজার-হাজার রাগ-রাগিনী রয়েছে তার ভেতর থেকে ওই পূরবীটি ছাড়া অন্য কিছু আমি বাজাতে পারি না বসার আগের মুহূর্তে হয়তো ভেবেছি অন্য রাগ বাজাব কিন্তু হাত দিয়ে বেরিয়ে এসেছে পূরবী। লোকের দোষ দিইনা, তাঁরা এক রাগ কেন বার বার শুনবে। এ কী যন্ত্রণা বল তো ?'

আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বিভাসের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে ধরালাম। বললাম, 'তোমার সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে বিরাট প্রহেলিকার মতো ঠেকছে। তুমি যদি সব কথা খুলে না বলো তাহলে আমি কি বুঝব ? তোমার দিদিটিকে ? ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁকে পেলে কোথা থেকে ? বিঠলভাই-তুঙ্গভদ্রা এরা কারা ? পূরবী দেবীর সঙ্গেই-বা এত ঘনিষ্ঠতা হল কি করে ? সব ঘটনাগুলো পর-পর বলে গেলে আমার পক্ষে বোঝার সুবিধে হয়—'

'তা তো বটেই!' বিভাস বলল, 'কিন্তু তাতে যে অনেক সময় নেবে।'

'তা নিক।' আমি বললাম, 'সারা রাত্রি আছে—'

'বেশ তবে শোনো।', বিভাস আরো এক পেগ শেষ করে গেলাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। তারপর সুরু করল বলতে। সেদিন সারা রাত্রি বসে এই গল্পটা বিভাসের কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম। কিন্তু শুধু কি বিভাসেরই গল্প ? আমার চোখের সামনে টুকরো টুকরো ভাবে নানাজনের ছবি ভেসে উঠেছিল। তাদের কাউকেই যে বাদ দেওয়া যায় না!

বিস্তার

মধুকুণ্ডু ষ্টেশনে আমার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে বিভাস সোজা চলে আসে কোলকাতায়। এর আগে সে কখনো কোলকাতায় আসেনি। একে শীতের রাত তার উপর কোলকাতার মতো বিরাট জায়গা দিশাহারা হয়ে যাওয়া তার পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। হাওড়া ব্রীজটাই সে দেখেনি কখনো ট্রাম বাসে ওঠার সাহস তার হয়নি। হাওড়া ব্রীজের ওপর সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। সে ভেবেছিল কোলকাতা এক মস্ত শহর, সেখানে বহু লোকের বাস, দেশ বিদেশ থেকে কত লোক এসে জায়গা করে নিচ্ছে প্রতি নিয়ত, তার মতো ছোট একটা ছেলের জায়গা হবে না? এই জোরে ভর্ করেই সে কোলকাতায় চলে এসেছিলো কিন্তু হাওড়া ব্রীজে দাঁড়িয়ে তার বার বার মনে হল এই ব্রীজটা ওপারের এক পাষাণপুরীর সেতুপথ; গঙ্গার ওপারটা বুঝি আরো অন্ধকার আরো অতল। মনের মধ্যে তার নানা ভয় নানা আতংক দানা বাঁধছিল। এদিকে রাত বেড়ে যাচ্ছিল; সে গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়ায় গলাবন্ধ কোটের গলার কাছটা চেপে ধরে শীতে হি হি করে কাঁপছিল আর ভাবছিল তাইতো এবার, যাওয়া যায় কোথায়? এখানে কে তাকে আশ্রয় দেবে?

'আমাকে একটু আশ্রয় দিতে পারেন?'—সে ধরল একটি লোককে লোকটি এমন কটমট করে তার দিকে তাকাল যে বিভাস দ্বিতীয় কথা বলতে সাহস পেল না। তার গলার ভিতরটা পর্য্যন্ত শুকিয়ে এল কিন্তু এখানে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। সে সাহসে

ভর্ করে পা পা করে ওপারে গিয়ে পৌঁছুল। কিন্তু বড় বাজারের মোড়ে এসে আবার সে দিশাহারা হয়ে গেল। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে বিপুল জনস্রোত। ট্রাম বাস আর গাড়ী ঘোড়ার হিড়িক। বড় বড় গাড়ি আর বিচিত্র কলরব। আবার তার গলা শুকিয়ে গেল ভয়ে সে নড়তে পারল না বড় বাজারের মোড় থেকে। কোনদিকে যাবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়। রাত গভীর হল। অমন জমজমাট বড় বাজারের মোড় আস্তে আস্তে নিঝুম হয়ে এল। দোকানে দোকানে ঝাঁপ পড়া সুরু হয়ে গেল, ট্রাম বাস আর লোকজন কমে এল। ক্রমশ ফাঁকা আর শান্ত হয়ে গেল বড়বাজার। শুধু দূরে দূরে জেগে রইল কানা দৈত্যের চোখের মতো এক ঠাং লাইট পোস্টের আলো গুলো আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল বেওয়ারিশ ঘেয়ো খুকুরেরদল। শীত যেন আরো চেপে নামল। দেখতে পেল পুলিশ বেরিয়েছে রোঁদে। কোথা থেকে সাহস পেল কে জানে, সে একটি পুলিশকে জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশ সাহেব, আজকের রাত্রিটা আমি কোথাও কাটাতে চাই দয়া করে একটা জায়গা বলে দেবে?'

শীতের রাত্রে টহল দিতে বেরিয়ে 'পুলিশ সাহেবের' মেজাজ বোধ হয় শরীফ ছিল না, এ হাত থেকে ও হাতে খৈনি ঢেলে ফাটতে ফাটতে বেশ কায়দা করে সে একবারে বিভাসের আগাগোড়া পর্য্যবেক্ষণ করল, তারপর বলল, 'তুমি চুরি করিয়েছো?'

'না হুজুর।—'

তব্? পকেট কাটিয়েছো?'

'না হুজুর'

'সর্দার তাড়িয়ে দিয়েছে?'

বিভাস ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। পুলিশটি ঠোঁট ফাঁক করে তার ভিতর খৈনি ঢেলে দিয়ে প্যাচ করে এক মুখ থুথু ফেলে বলে, 'হুঁ হুঁ হামি শালা সব জানে। চলো ফাঁড়িমে—'

একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করল বিভাস কিন্তু ধোপে টিকল না। পুলিশটি এতদিন পরে একটা সাচ্চা শিকার পাকড়েছে, অত সহজে কি

ছাড়ে ? বিভাসকে টানতে টানতে থানায় নিয়ে গিয়ে ইনচার্জের হাতে সঁপে দিল। আর রং ফলিয়ে বেশ সরস বিবরণ দিল এই যে, ছেলেটা অত্যন্ত সন্দেহ জনকভাবে বড় বাজারের মোড়ে ঘোরাঘুরি করছিল, তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেতেই পালাবার পথ না পেয়ে নিরীহ গোবেচারীর মতো কাছে এসে জিজ্ঞেস করে আজ রাত্রের মতো থাকার কোন আস্তানার সন্ধান দিতে পারি কিনা। হুজুর, পাক্কা শয়তান। দাওয়াই চালান, অনেক খবর পেয়ে যাবেন।

বিভাস কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলো, সে বলল, সার, আমাকে একটু জল দেবেন ? পিপাসা পেয়েছে—'

তাকে জল দেওয়া হয়।

তারপর সে ফাটকবন্দী হয়ে থাকে সাতদিন। নিজের নাম আর কোলকাতায় আগমনের উদ্দেশ্য ছাড়া সে আর কোন কথা বলেনি। সাত-দিন পরে ছাড়া পেয়ে সে ফুটপাতে ফুটপাতে ঘুরতে থাকে। কোলকাতায় এসেই প্রথম দিন তার যা অভিজ্ঞতা হলো তাতে সে শক্ত হলো বেশ। পাষাণপুরীর অভ্যর্থনা সে ভাল করেই পেল। মনটা শক্ত হয়েছে, শরীরটাও অনেক কিছু সহ্য করেছে। কিন্তু এই সাতদিন দুটো বিষয়ে সে একটু নিশ্চিন্ত ছিল, প্রথম হল খাওয়ার সমস্যা দ্বিতীয়টি হল থাকা ফাটক থেকে বেরিয়ে সে দুটিও তার ঘুচল। বিভাস ঘুরে বেড়ায় এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় কোনদিন পড়ে থাকে ফুটপাতে কোনদিন বা কারো বাড়ীর রোয়াকে। তার মালুম হয়ে গেছে কোলকাতা বড় শক্ত ঠাঁই। এখানে সহজে কোন আশ্রয় মেলে না। একেবারে নিচু থেকে সুরু করে ওপরে উঠতে হবে। এইভেবে এক বাড়ির রোয়াকে শুয়েছিল সে, ভোর বেলা ঘুম ভেঙে গেল এক ভদ্র লোকের খিঁচুনিতে।

'এই ছোঁড়া রাঁধতে জানিস ?'

বিভাস চোখ রগড়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়, 'আজ্ঞে—'

'বলি চাকরি করবি ? বামুনের ছেলে তো ?'

বিভাস তাড়াতাড়ি কোটের ভিতর থেকে ময়লা পৈতেটা বার করে,

'আজ্ঞে হ্যাঁ সার—'

'রাঁধতে জানিস ?'

'জানি সার—'

'তাহলে চলে আয়।'

ভদ্রলোক ওকে বড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর হাতে সঁপে দিলেন। দু'চারটে কথাবার্তার পর বিভাস লেগে গেল রাঁধুনির কাজে। কিন্তু ভয়ংকর মুখরা আর খুঁতখুঁতে তাঁর স্ত্রী। অনেকগুলি ছেলে পুলে। তারউপর রুগ্ন শরীর। আগুনের কাছে যাওয়া ডাক্তারের মানা। রাঁধুনি বামুনের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে স্বামীটি বিভাসকে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলেন কিন্তু বিভাসের অপটু রান্নায় স্ত্রীটি দুদিনেই আগুন হয়ে উঠলেন। থু থু করে রান্না ফেলে দেন আর খিঁচিয়ে ওঠেন বিভাসকে, স্বামীকে। সুতরাং ফের তাঁকে বেরুতে হল নতুন রাঁধুনির সন্ধানে। বিভাস মাসদুয়েক কাজ করার পর তার জায়গায় এল নতুন পাচক। সে আবার নামল রাস্তায়।

কলের জল খেতে পয়সা লাগে না। বিভাস কলের জল খায় আর ফুটপাতে ফুটপাতে ঘোরে কোথাও গান বাজনা হচ্ছে শুনলে থমকে দাঁড়ায় আর কানপেতে শোনে। মনে মনে ভাবে কিছু টাকা জমাতে পারলে সে নির্ঘাৎ একটা সেতার কিনবে সে তলে তলে দরদামও করেছে নতুন ও পুরোনো সেতারের। বাজনার দোকান দেখতে পেলে সে আর নড়তেই চায় না। আঙুল দিয়ে এ-যন্ত্র ও-যন্ত্র ছোঁয় দোকানদার দাবড়ানি দিলে হাত গুটিয়ে নেয়। আবার হাঁটতে থাকে সে। এই রকম হাঁটতে হাঁটতেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা ক্লাব ঘরের মহড়া শুনছিল। রাত্রি হয়ে গেছে, আবছা চাঁদের আলো। ক্লাবঘরে জোর মহড়া চলছিল আর খাওয়ার চিৎকার উঠছিল। বোধ হয় আজ ফিস্ট। বিভাসের পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। খাওয়ার পরে এক ভদ্রলোক পানের পিচ ফেলবার জন্যে জানালার কাছে আসতেই তাকে দেখতে পায়, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠেঃ 'এই, ছোঁড়া ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস ? এদিকে আয়—'

বিভাস্ এগিয়ে গেল। লোকটি তাকে আগাগোড়া তীক্ষ্ণভাবে

পর্যবেক্ষণ করে বলে, 'হুঁ, চেহারাটা মন্দ নয়। হ্যাঁরে পার্ট টার্ট করতে পারিস ?'

বিভাস এতদিনে পোড় খয়ে বেশ দোরস্ত হয়ে উঠেছে। অম্লান বদনে সে তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়ল, 'মেল্ না ফিমেল স্যার ? তার আগে খাওয়ান দিকিনি কিছু! ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে—'

সে ভিড়ে গেল সেই সখের থিয়েটার পার্টিতে। চেহারাটা তার বরাবরই সুন্দর। নাবালক রাজকুমারের ভূমিকায় তাকে চমৎকার মানাল। যে কদিন রিহার্সাল ছিল সে কদিন খাওয়া দাওয়ার কোন সমস্যা ছিল না। ক্লাব-সভ্যদের যে কারোর বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসত আর রাত্রিবেলা ক্লাবঘরেই শুয়ে থাকত। মাসখানেক এই রকম বহাল তবিয়তে থেকে এসে গেল অভিনয়ের দিন। সুন্দর অভিনয় করল বিভাস। কিন্তু পরদিন থেকেই সে হয়ে গেল বেকার।

'প্রাণকেষ্টদা ?' বিভাস ডাকল সেই ভদ্রলোকটিকে।

'কি বলছিস ?' প্রাণকেষ্টদা খুশি মেজাজে ছিলেন বললেন, 'বুঝেছি। এই নে—'

একখানা পাঁচটাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন। বিভাস নোটটা নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'কিছু বলবি ?'

বিভাস আরো একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার সেই টিউশ্যানিটা—'

'বলেছিলুম বুঝি !' প্রাণকেষ্টদা বললেন, 'তা ক'দ্দূর পড়াশোনা করেছিস ?'

'ক্লাশ থ্রী-ফোরের ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারব।' বিভাস বলল, 'ম্যাট্রিক পর্যন্ত।'

'ম্যাট্রিক পর্যন্ত !' প্রাণকেষ্টদা কি ভাবলেন, তারপর বললেন 'আচ্ছা চল্ অধীরবাবুকে গিয়ে বলি—'

অধীরবাবু ও পাড়ারই লোক। অল্প টাকার এক মাষ্টারের কথা তিনি অনেকদিন ধরেই বলেছিলেন তাঁকে। আড়তদার মানুষ।

প্রাণকৃষ্ণবাবু বিভাসকে সঙ্গে করে নিয়ে মাস্টারের কথা বলতেই নাকের উপর ঝুলে-পড়া চশমাটা তিনি ঠেসে নাকে আঁটলেন। তারপর মাল যাচাইয়ের মতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন বিভাসকে। বললেন, 'না বাপু, আমার ছেলেমেয়ে দুটির জন্য একজন ভারিক্কি মাস্টার চাই। তাদের শাসন করা শক্ত। শেষকালে দেখব তারাই তোমাকে পড়াতে আরম্ভ করেছে।'

প্রাণকেষ্টদা বললেন, 'দিন কতক দেখুন-না রেখে। তেমন হলে—'

অধীরবাবু ফের তাকালেন বিভাসের দিকে। বললেন, 'আচ্ছা, বেশ, তুমি যখন বলছো—'

বিভাস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মনে মনে প্রাণকেষ্টদাকে সে অজস্র কৃতজ্ঞতা জানাল। কিন্তু এই স্বস্তি তার বেশিদিন রইল না। অধীরবাবুর ছেলে আর মেয়ে তুফান আর শীলাকে সে কিছুতেই শাসনে রাখতে পারে না,—তার চেয়ে বড় কথা বাড়ির পরিবেশটা আরও খারাপ। অধীরবাবু সারাদিন দোকানে থাকেন, স্ত্রী বাতে পঙ্গু। বিধবা এক শ্যালিকা সংসার চালায়। তার নিজেরও তিনটি ছেলেমেয়ে। পাঁচটিতে মিলে বাড়ি একবারে মাথায় করে রাখে। আর আছে এক বিধবা বোন।

অধীরবাবুর স্ত্রীকে অসুখী মনে হয় তার। তাঁকে মোটেই প্রসন্ন দেখা যায় না নিজের বোনের উপর। কখনো কখনো—নগ্নভাবে সে সব কথা উঠে পড়ে তার সামনেই। দুই বোনের মধ্যে একটা কুৎসিত মনোমালিন্য সব সময় যেন উগ্রভাবে ফুটে আছে। বিভাবতী বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না এই যা রক্ষা, নইলে চুলোচুলি খুনোখুনি হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্ত্তে। সে-কথা প্রভাবতী জানেন, তাই পারত-পক্ষে দিদির সামনে যান না সংসারের অফুরন্ত খাটুনি সত্বেও তাঁকে বেশ হাসিখুশি দেখায়। বিভাস লক্ষ্য করেছে শ্যালিকার ওপরেই অধীরবাবুর পক্ষপাত কিঞ্চিত অধিক। কোন কোন রাত্রে অধীরবাবুর ঘর থেকে বিভাবতীর চাপা উত্তেজনা বিভাস শুনেছে: 'পা টিপে টিপে ফিরে আসবার কি দরকার ছিল! যার ঘরে এতক্ষণ কাটিয়ে এলে বাকি রাতটা সেইখানে কাটালেই তো পারতে! ছিঃ ছিঃ।'

অধীরবাবুর বিধবা বোন সুরমাকেও কি রকম অস্বাভাবিক লাগে বিভাসের। পুরন্ত যৌবন। পূজো আচ্চা নিয়েই থাকেন, গীতা ভাগবত পড়েন, কিন্তু তাতেও যেন সব সময় স্বস্তি পান না। নিস্পৃহ নিরাসক্ত থাকার চেষ্টা করেন, প্রতিদিন গঙ্গাস্নান এবং ঠাকুর পূজোর মধ্যে অনেকখানি সময় কাটান, তবু বিভাস লক্ষ্য করেছে কোথা থেকে একটা দুঃসহ জ্বালা এসে ভদ্রমহিলার দুচোখের ওপর ভর করে। ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে তাঁর চোখ দুটো। বিভাস আরও লক্ষ্য করেছে ভদ্র-মহিলা অকারণে রেগে ওঠেন, কখনো-কখনো ফিট্ হয়ে পড়ে যান। বিভাস তাঁর মাথায় জল ঢালে, বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়। বিভাবতী বিছানায় শুয়ে শুয়ে গজগজ করেন, প্রভাবতী একবার দেখে গিয়েই ফের ছোটে রান্নাঘরে হেঁসেল সামলাতে, ছেলেমেয়েরা চলে যায় ইস্কুলে। ফাঁকা বাড়িতে একা বিভাস অস্বস্তি বোধ করে শুশ্রূষা করতে গিয়ে। অমাবস্যায় পূর্ণিমায় সুরমা দেবী উপোস দেন, একাদশী পালন করেন নিষ্ঠার সঙ্গে। বাকি সময়টা বইয়ের যোগান দিতে হয় বিভাসকে। পাড়ার লাইব্রেরির সব নাটক নভেল তিনি নাকি পড়ে ফেলেছেন, অন্য লাইব্রেরির থেকে বই এনে দিতে হয়। প্রত্যেকটি বাংলা সিনেমা তাঁর দেখা চাই-ই। বিভাসকে সঙ্গে যেতে হয়। আবার অম্বলের ব্যথা আছে। মাথার যন্ত্রণা হয় প্রায়ই। সন্ধ্যের পর অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে থাকেন বিছানায়। বিভাস ছেলে-মেয়েদের যথাসাধ্য পড়িয়ে হাওয়া খাবার জন্যে ছাদে উঠতে যাচ্ছিল, সিঁড়ির পাশেই সুরমা দেবীর ঘর, দেখতে পেয়ে সুরমা দেবী ডাকেন, 'বিভাস, আমার বালিশ বিছানাটা ছাদে নিয়ে চলো তো, বড্ড মাথা ধরেছে।'

সুরমার বালিশ-বিছানা নিয়ে বিভাস ছাদে উঠে পেতে দেয়।

একটু হাওয়া পাওয়া যায়। সুরমা বলেন, 'আঃ বাঁচলুম।'

বিভাস ছাদের আলসেতে ভর্ দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে, কোলকাতায় মানুষ বেঁচে আছে কি করে? একটু ফাঁক নেই। কী ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি বাড়ি। ছাদে উঠলে শুধু দেখা যায় ঘষা কাচের মতো ফ্যাকাশে নীল আকাশ। অসংখ্য তারা ফুটেছে। দূরে এক কোণায় পঞ্চমীর ক্ষীণ

বাঁকা চাঁদ। মরা জ্যোৎস্নায় আকাশ খানা ছেয়ে আছে। নিচে থেকে উঠছে ট্রাম বাসের শব্দ, লোকজনের মিশ্র কোলাহল। মনে হচ্ছিল, পার্থিব সব শব্দগুলো একটা ঐকতানে মিশে গিয়ে রচনা করছে এক অপার্থিব সুরলোক—নিচে থেকে শব্দগুলো উঠে এক হয়ে মিশে যাচ্ছে বুঝি ওই তারাদের দেশে। সেখানে রচনা করছে এক মহাসংগীত।

'জানেন, আমি সেতার বাজাতে পারি?'

কাকে, কি জন্যে সে যে এই কথাগুলো বলল তা নিজেই জানেনা।

কিন্তু শুনল, সুরমা দেবী যেন বিরক্তস্বরে বলছেন, 'আঃ মাথাটা যে গেল! কতবার ডাকব, একটু টিপে দাও না!'

বিভাস তাড়াতাড়ি সুরমা দেবীর মাথার কাছে এসে বসল, নরম আঙুলে টিপে দিতে লাগল মাথা। কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে পড়ে রইলেন সুরমা দেবী। তারপর ওর হাতটা টেনে নিলেন নিজের বুকের ওপর। আবেশ জড়িতস্বরে বললেন, 'কী ঠাণ্ডা তোমার হাত! সারা গা যেন জুড়িয়ে গেল!'

অস্বস্তি বোধ করছিল বিভাস তবু নিজের হাতটা সুরমা দেবীর ইচ্ছার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে দিল। আবছা চাঁদের আলোয় সুরমা দেবীকে কি রকম অসুস্থ দেখাচ্ছিল। ওর হাতখানা কখনো তিনি চেপে পিষে দিচ্ছিলেন বুকের উপর, কখনো জ্বরো রুগীর মতো ঘন ঘন শ্বাস ফেলছিলেন। বিভাসের মনে হল সুরমা দেবী বুঝি ফিট হয়ে যাবেন। ভয় পেয়ে সে বলল, 'সুরমাদি, খুব কষ্ট হচ্ছে আপনার? প্রভাদিদিকে ডাকব? নিচে যাবেন?'

সুরমা দেবী শ্বাস টেনে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'না-না-না. কাউকে ডাকতে হবে না, আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না—'

দুহাতে বিভাসকে টেনে তিনি বুকের উপর চেপে ধরলেন। হাত নয়, শক্ত লোহা। সারাদিন উপোস দেওয়ার পরেও তাঁর শরীরে এত জোর কি করে আসতে পারে বিভাস ভেবে পেল না। তার দম আটকে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ সেইভাবে আটক থেকে বিভাস আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। বলল, 'চলুন, এবার নিচে যাই।'

সুরমা দেবী শ্রান্তস্বরে বললেন 'তুমি যাও। আমি পরে যাচ্ছি।'

এইভাবে দিনের পর দিন চলছিলো।

একদিন সকালে অধীরবাবু গম্ভীরস্বরে ডাকলেন, 'ওহে ম্যাষ্টর, শোনো এদিকে—'

বিভাস ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজছিল, কাছে এসে দাঁড়াইতেই অধীরবাবু বললেন, 'এখনো মাসটা শেষ হয়নি, পুরো মাইনেটাই দিলুম। দুপুরবেলা ফিরে এসে তোমাকে যেন দেখতে না পাই—'

বিভাস হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

অধীরবাবু চলে যাবার পর শীলা এসে পাশে দাঁড়ায়। এখনো ফ্রক পরে, মাষ্টার মশাইকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এপাশ ওপাশ থেকে পাখির মতো দুবার উঁকি মারল, তারপর চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'কাল পিসিমার সঙ্গে কী করেছিলেন মাষ্টার মশাই, মাসিমা সব দেখেছে। বাবাঃ, কী অসভ্য আপনি—'

বিভাস প্রচণ্ডস্বরে ধমক দিল একটা।

কিন্তু বুঝতে পারল এখানে থাকা আর তার চলবে না। সে আবার নামল রাস্তায়। আটমাস টিউশ্যানি করে হাতে কিছু জমেছিলো, তাই ভাঙিয়ে কিছুদিন চলল। অনির্দিষ্টভাবে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, ফুটপাতে গাছতলায় গাড়ি বারাণ্ডায় রাস্তায় শুয়ে থাকে। মাথার ওপর দিয়ে চলে যায় একটা বর্ষা। একটু একটু করে নেমে আসে শীত। তালি-মারা পুরোনো কোটটা গায়ে চড়ায়- চেপে ধরে গলার কাছের বোতামটা। ওটা তার বদ অভ্যাস। কোটটা গায়ে হয় না, টান হয় শরীরে, ছোট হয় ঝুলে। ছেঁড়া স্যাণ্ডেলটা পায়ে দিয়ে ছোট কোটটা গায়ে চড়িয়ে সে অলসভাবে পথ হাঁটে। রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত ঘোরে। আলাপ হয় একটি চায়ের দোকানের বয়ের সঙ্গে। চায়ের দোকানের সঙ্গে খাবারের দোকান। বয়টির খাটুনি বেড়েছে কিন্তু সেই তুলনায় মাইনে বাড়েনি। অমূল্য বলল, 'মালিক শালা হাড় কঞ্জুস, ডবল্ খাটাবে অথচ একটা পয়সা বেশি দেবে না। আমিও শালা টাইট করে দিয়েছি। ফাঁকি লাগাই।'

বিভাস বলে, 'জানো আমি সেতার বাজাতে পারি!'

অমূল্য বলে, 'যাঃ শালা, কি কথা থেকে কী কথা! চলো আমার সঙ্গে মালিকের কাছে। দেখি বলে-কয়ে।'

সেদিনের সেলুটা বোধহয় ভালই হয়েছিল। মালিক বিশ্বম্ভরবাবু বসে বসে ক্যাশ গুণছিলেন। অমূল্য বিভাসকে নিয়ে ঢুকল। দুজনে বিশ্বম্ভর বাবুর সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ক্যাশ গোনা হয়ে গেলে বিশ্বম্ভরবাবু চোখ তুলে তাকালেন, 'কি চাই তোমার?' অমূল্য তার নিজের বক্তব্য নিবেদন করল। ছেলেটার গুছিয়ে বলার ক্ষমতা আছে। খদ্দেররা হল এক একটি ক্ষুদে নবাব। মুখের কথা খসাতে না খসাতেই চায়ের কাপটি না পেলে কিংবা খাবারের প্লেটটি না এলে তাদের মেজাজের বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটে, এটা মালিক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। অনেক খদ্দের চলে যায়, কারো-কারো সত্যি তাড়াতাড়ি থাকে। খদ্দের হল গিয়ে লক্ষ্মী। আর দোকানটা বাড়ছে। সুতরাং ব্যবসার সুবিধের জন্যে এখন থেকেই আরো একটি বাড়তি লোক রাখা দরকার। এখন মালিকের যা অভিরুচি।

বিরাট বপুখানা ঘুরিয়ে কুতকুতে ছোট ছোট দুটো চোখে মালিক বিশ্বম্ভরবাবু বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বিভাসের দিকে। তারপর একে-একে নামধাম জিজ্ঞাসার পর আসতে বললেন পরদিন। অমূল্য তাকে দোকান ঘরেই নিজের সঙ্গে থাকতে দিল সেই রাত্রে। পরদিন বিশ্বম্ভরবাবু তাকে দিলেন কাপ-ডিস ধোয়ার কাজ, খাবারের টেবিল পরিষ্কারের কাজ। বললেন, 'এক হপ্তা কাজ করো, দেখি, তারপর ভাবা যাবে। তবে চুরিচামারির অভ্যেস থাকলে এখানে সুবিধে হবে না তা আগেই বলে রাখছি।'

বিভাস থেকে গেল দোকানে। বিশ্বম্ভর বাবুর ভাগ্য তখন উঠতির দিকে। সত্যি দোকানটা ক্রমে ক্রমে বাড়ল। খদ্দেরদের ভিড় হতে লাগল। কারিগর বাড়াতে হল, অমূল্য ও বিভাস ছাড়া আরও একজন বয়কে রাখতে হল। অমূল্য ও বিভাস গাধার মতো খাটে কিন্তু তিন নম্বর বয় মুকুন্দ অনেক চালাক চতুর। মালিক গাল দিলে সেও চটপট

জবাব দেয়। মুকুন্দ এর আগে দু' তিনটে দোকানে কাজ করেছে, একটু উদ্ধত প্রকৃতির। তার চাল-চলনটাও কি-রকম বেয়াড়া। ঘন ঘন বিড়ি ফোঁকে, পান চিবোয়, টেরি কাটে, প্রতি হপ্তায় বায়স্কোপে যায়। মুখে সস্তা ফিল্মের গান আর নারীচর্চা। ওর পাল্লায় পড়ে অমূল্য মাঝে মাঝে তার সঙ্গে সিনেমা-থিয়েটারে যায়, এখানে ওখানে ঘোরে, আড্ডা-ইয়ার্কি দেয়। কিন্তু বিভাসকে বড়-একটা দেখা যায় না ওদের দলে। সে সিনেমাও দ্যাখে না, বিড়ি-সিগারেটও খায় না। মুকুন্দ তাই ব্যঙ্গ করে বলে, 'ও শালা সতী হয়ে গেল মাইরি।' অমূল্যরও একটু বাড়াবাড়ি লাগে ওর আচার-আচরণ। সে বলে, 'বিভে, তুই মাসে মাসে টাকা জমিয়ে কি করিস র‍্যা? কার কাছে পাঠাস? কে আছে তোর?'

অমূল্যর সঙ্গে চোখে-চোখে মুকুন্দর কি ইসারা হয়। মুকুন্দ বলে, 'মাইরি, কেউ আছে নাকিরে তোর?' তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে, জিব দিয়ে ঝোল টানে।

বিভাস বলে, 'আমি একটা সেতার কিনব—'

অমূল্য টুসকি মেরে বিড়িটা দূরে ফেলে দিয়ে বলে, 'যাঃ শালা!'

কিছু টাকা বিভাসের জমেছিল। খাওয়া ও থাকার বিনিময়ে মালিক তাকে মাসে দশটাকা করে দিত তা থেকে প্রতি মাসে কিছু কিছু করে জমিয়ে এক বছরে পঞ্চাশ টাকা হয়েছিল—মালিকের কাছে তা জমা আছে। দোকান ঘরেই সে শুয়ে থাকে, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অফুরন্ত খাটে। মালিকের বিশ্বাসভাজন হবার জন্যে তার কাজকর্মের কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু কেমন করে যেন মালিকের ক্যাশ-বাক্স থেকে দশটাকার চারখানা নোট চুরি হয়ে গেল। মালিক কয়েক মিনিটের জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন, চাবিটা দিতে মনে ছিল না, ফিরে এসে বাক্স খুলে দেখলেন নোটের তাড়া থেকে চারটি দশটাকার নোট উধাও। আর, তক্ষুনি তাঁর মনে পড়ল বাইরে থেকে দোকানে ঢোকবার সময় তিনি বিভাসকে ক্যাশ-টেবিলের কাছ থেকে সরে যেতে দেখেছিলেন। সুতরাং বিকট হাঁক ছাড়লেন তিনি, 'বিভে, এই ছোঁড়া, এদিকে আয়—'

রাত নটা তখন। কিছু খদ্দের দোকানে ছিল। তাঁরাও চমকে ফিরে তাকালেন। বিভাস কাছে আসতেই বিশ্বম্ভর বাবু তার কোটের কলার চেপে ধরলেন, 'শিগগীর বার কর্ টাকা, নইলে মেরে খুন করে ফেলব। হতভাগা চোর বজ্জাত—'

অমূল্য আর মুকুন্দ ছুটে এল। কারিগরেরা উঠে এল। খদ্দেররা ভিড় করে দাঁড়াল। ফুটপাতেও দাঁড়িয়ে পড়ল কয়েকজন।

'কি হয়েছে মশাই ?'

'চোর। একের নম্বর চোর।' বিশ্বম্ভর বাবুর বিরাট বপু রাগে উত্তেজনায় কাঁপছে, 'নিজের চোখে দেখলুম ওকে ক্যাশ বাক্সের কাছ থেকে সরে যেতে। চার চারটে দশটাকার নোট গাপ্ মেরেছে—'

'ভারি অন্যায় !' একজন খদ্দেরের মন্তব্য।

'আমি টাকা চুরি করিনি।'—বলে বিভাস।

'করিসনি ?' বিশ্বম্ভরবাবু ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিলেন ওর গালে : 'বার কর্ বলছি এখনো, নইলে ঘাড় ধরে বিদায় করে দোব—'

'আমি চুরি করিনি।'—বিভাস দৃঢ়স্বরে বলল।

'তাহলে কি পাখা গজিয়েচে নোটগুলোর ? পেচ্ছাব করতে যাবার সময় দেখলুম ঠিক রয়েচে ফিরে আসতে না আসতেই উড়ে গেল ? দেখি তোর পকেট—'

বিভাসের পকেট হাতড়ে কিছুই পাওয়া গেল না। 'কী ঘোড়েল ছেলে দেখুন ! এইটুকু সময়ের মধ্যেই সরিয়ে ফেলেছে।' বিশ্বম্ভরবাবু এক ধাক্কা দিয়ে ওকে বার করে দিলেন দোকান থেকে : 'যা বেরো, বেরো আমার সামনে থেকে,—তোর মুখ দেখতে চাইনা !' বিভাস হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফুটপাতে। বুড়ো আঙুলটা মুচ্‌কে গেছে, ঝিনঝিন করছে। ঝিনঝিন করছে পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে মাথার ভিতরটা পর্যন্ত। একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। টাকা সে সত্যি নেয়নি, কে নিয়েছে তাও সে জানেনা, বিনা দোষে সব শাস্তিটুকু এসে পড়ল তার ঘাড়ে। রাগে দুঃখে লজ্জায় তার চোখ ফেটে জল আসছিল। মুকুন্দ

তার পিছনে এসে দাঁড়াল। তাকে খুব কুন্ঠিত দেখাচ্ছিল। সে বলল, 'বিভু, তোর যা জিনিষপত্তর আছে নিয়ে যা।'

দোকানের ভিতর ফের ঢুকল বিভাস। দোকান ঘরে রাত্রি বেলা শুয়ে থাকে সে আর অমূল্য। শুয়ে থাকার জন্যে মাদুর বালিশ আর পরণের জন্যে দু'তিনটে আধ ময়লা কাপড় জামা এবং গামছা। মাথার কাছে দেয়ালে সে ঝুলিয়ে রেখেছিল একটা ক্যালেণ্ডার—একজন সেতার বাদকের ছবি। ছবিটা কার তা সে জানেনা কিন্তু সেতার বাজাচ্ছে বলেই ছবিটার মূল্য তার কাছে অসীম, বিভাস আস্তে আস্তে শুধু সেই ছবিটা পেড়ে নিল। বলল, 'আমি এই ছবিটা নিয়ে যাচ্ছি, আর কিছু দরকার নেই।'

অমূল্য বলল, 'তোর টাকা নিবিনে মালিকের কাছ থেকে?'

বিভাসের মনে পড়ল প্রতি মাসে একটু একটু করে সে গোটা পঞ্চাশ টাকা জমিয়েছে এবং তা জমা আছে মালিকের কাছে। তার সেতার কেনবার টাকা। বিভাস মালিকের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। 'আমার টাকা গুলো দিন্।'

'তোর টাকা?' মালিক তখনো রাগে গর্ গর্ করছিলেন। তারপর বুঝি মনে পড়ল। বাক্স খুলে একখানা দশটাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'নে ধর্। বেরিয়ে যা—'

বিভাস বলল, 'দশ টাকা?'

'এখনো তোকে পুলিশে দিইনি এই তোর বাপের ভাগ্যি। বেশি বক্ বক্ করিসনি। বাকিটা ফেরৎ পাবি না, ওটা কেটে নিয়েছি—'

ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার আর কোনপ্রকার প্রবৃত্তি বিভাসের ছিল না। সে দোকান থেকে বেরিয়ে খানিকক্ষণ উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে ঘুরল। ফের এসেছে শীতকাল। এই নিয়ে পাঁচ পাঁচটা শীত কেটে গেল ওর শরীরের ওপর দিয়ে। কিন্তু কোলকাতাকে তার যেমন পাষাণপুরী মনে হয়েছিল আজ পাঁচ বছর পরেও তার ঠিক তাই মনে হতে লাগল। পাষাণপুরী কোলকাতা। এখানে প্রাণ নেই—এখানে ফালতু কারো স্থান নেই। পাঁচ বছর ধরে সে শুধু পাষাণে মাথা খুঁড়লো। কি আশ্চর্য কামনা নিয়েই-না

সে এসেছিল ; 'আমি সেতার বাজাতে জানি, আমি সেতার শিখতে চাই !' কোলকাতার পাথরে পাথরে তার সে কান্না বৃথাই ঘা দিয়ে ফিরল, কেউ সাড়া দিল না, কোথাও ঠাঁই পেল না। তার মনের ভিতরটা কান্নায় কান্নায় গুমরে উঠছিল। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল অশ্রুজলে। সে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দিন পরে হাওড়া ব্রীজে এসে উঠল। লোহার পাত দিয়ে মোড়া প্রকাণ্ড সুন্দর ব্রীজটা পাঁচ বছর আগের মতোই এপার ওপার সংযোগ রক্ষা করছে। এপারে কোলকাতা ওপারে হাওড়া। শুধু সংযোগ হারাল বিভাস। ব্রীজের মাঝ বরাবর হেঁটে এসে রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে গঙ্গার নিথর নিষ্কম্প বুকের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে পড়ল তাদের গ্রামের কথা। এই গঙ্গা তাদের গ্রামের কোল ছুঁয়েও বয়ে গেছে। তাদের গ্রাম! গঙ্গার কূলে ছবির মতো সাজানো। এতদিন পরে তার নিজের গ্রামের জন্যে বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। কিন্তু সে গ্রামে আর ফিরে যাওয়া যায় না। তবে সে যাবে কোথায়? মনে পড়ল শ্রীরামপুরে তার এক বন্ধু বরুণের মামার বাড়ি। বরুণের সঙ্গে কতদিন গিয়েছে শ্রীরামপুরে। ওর মামা আর মামিমা বড় ভাল লোক। কতদিন থেকে যেতে বলেছেন তাঁদের বাড়িতে। আজকের রাত্রিটা তো সেইখানে কাটিয়ে আসা যায়!

কথাটা মনে হতেই সে হনহন করে পা চালিয়ে দিল হাওড়া স্টেশনের দিকে। রাত কম হয়নি। লোকজন নেই বলা চলে। খুব দ্রুতপায়েই সে আসছিল—প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে। হাওড়া স্টেশন ফাঁকা। টিকিট ঘরের দিকে দ্রুতপায়ে বাঁক নিতে গিয়েই তার সঙ্গে একটি তরুণীর ধাক্কা লাগল। সুবেশা সুসজ্জিতা মধ্যবয়সী একটি তরুণী। তরুণীটি আসছিল অলস পায়ে ভিতরের দিক থেকে বেরিয়ে আর বিভাস যাচ্ছিল বাইরের দিক থেকে ভিতরে। ধাক্কা লেগে তার হাত থেকে ছিটকে গেল কারুকাজ-করা একটি দামী ভ্যানিটি ব্যাগ। বিভাস তাড়াতাড়ি সেটা তুলে দিয়ে বলল, 'মাফ করবেন। দেখতে পাইনি—'

তরুণীটি বিস্মিত হয়ে ব্যস্তবাগীশ বিভাসের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল। বিভাস আশংকা করছিল লাস্ট ট্রেন বুঝি পাবে

না। সে তরুণীর ব্যাগটি তুলে দিয়েই কাউণ্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার কোটের পকেট বেমালুম কাটা। এতখানি পথ আসতে তার অন্যমনস্কতার সুযোগে কে কখন কোটের পকেট কেটে শেষ সম্বল দশটাকার নোটটীও আত্মসাৎ করে নিয়েছে। তরুণীটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার বিব্রতকর অবস্থা লক্ষ্য করছিল। এবার কাছে এসে বলল, 'কি হল? পকেট কাটা গেছে বুঝি?'

বিভাস কোন কথা না বলে অসহায়ভাবে তার মুখের দিকে শুধু তাকাল।

'কোথায় যাবে?'

'শ্রীরামপুর।'

'এই নাও। তাড়াতাড়ি টিকিট কাটোগে, এখুনি ট্রেণ ছেড়ে দেবে—' মেয়েটি ব্যাগ খুলে একখানা একটাকার নোট বাড়িয়ে দিল তার দিকে। বিভাস অস্ফুটস্বরে কী যেন বলল তারপরই কাউণ্টারে হাত গলিয়ে দিল। সেই সময় বাঁশি বাজিয়ে লাস্ট ট্রেণ ছেড়ে গেল হাওড়া স্টেশান। বিভাস দৌড়ে গিয়েও ধরতে পারল না। হতাশ চোখে ট্রেনের পিছনের লাল বাতিটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে ফিরে এল। মেয়েটি তখন স্টেশানের বাইরে বেরোবার পথ ধরেছে, বিভাস তার কাছে গিয়ে বলল, 'এই নিন আপনার টাকার বাকি চেঞ্জ! ধন্যবাদ—'

'ধরতে পারলে না ট্রেণটা?'

'না।' বিভাস বেশ সহজস্বরে বলল, 'কপালে লেখা আছে ফুটপাত ট্রেণ ধরব কি করে।'

মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়েছিল ওর কথা শুনে, এবার বলল, 'কোলকাতায় কোথায় থাকো? যদি সেখানে যেতে চাও আমার মোটরে আসতে পারো। ড্রাইভার তোমাকে পৌঁছে দেবে—'

বিভাস তেমনি সহজভাবেই বলল, 'কোথাও আমার কেউ নেই। শ্রীরামপুরে এক বন্ধুর মামার বাড়িতে যাচ্ছিলাম আজকের রাত্রিটা কাটাবার জন্যে।'

'এখন কি করবে ?'

'সেই কথাই তো ভাবছি।' বিভাস বলে, 'পাঁচটি বছর আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসি আমি সেতার শিখব বলে কিন্তু এমন ভাগ্য কোথাও একটু ঠাঁই পেলাম না—'

মেয়েটি বলল, 'তুমি এসো আমার সঙ্গে।'

'চলুন—'

স্টেশনের বাইরে মোটর দাঁড় করান ছিল, মেয়েটির সঙ্গে বিভাস মোটরে উঠল। মোটর ছেড়ে দিলে মেয়েটি গা এলিয়ে দিল। বিভাসের চেয়ে বয়সে বড়। চোখে মুখে বয়সের ছাপ তেমন পড়েনি, কিন্তু শরীর ভারিক্কি হয়েছে। প্রসাধনের ছটায় একটা উগ্র গন্ধ মোটরের ভিতর ছড়িয়ে পড়ছিল। বিভাসের মনে তখন কোন অনুভূতি নেই। গঙ্গার ফাঁকা হাওয়ায় তার কাঁপুনি লাগছিল, কোটের গলার কাছটা চেপে ধরে সে একপাশে বসেছিল চুপ করে। মেয়েটি বলল এক সময়, 'কই জিজ্ঞেস করলে না তো কোথায় যাচ্ছ ?' তারপর বলল 'জানো আমি কে ?'

বিভাস ক্লান্তস্বরে বলল, 'এই পাঁচ বছরে কোলকাতা আমাকে এমন কতকগুলো শিক্ষা দিয়েছে যে ও সব ফালতু কথা আমার মনেও আসে না! অন্তত ফুটপাতে থাকার চেয়ে ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন এটুকু বিশ্বাস করি। আর এইভাবে আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমার মনে হয়েছে আমি ভাগ্যবান—'

মেয়েটির মন হঠাৎ প্রসন্নতায় ভরে উঠল, বিভাসের দিকে চেয়ে স্নিগ্ধস্বরে বলল, 'আমার নাম লোপামুদ্রা। তুমি আমাকে মুদ্রাদি বলে ডেকো, কেমন ?'

বিভাস মোটরের পেছনে আবার মাথা এলিয়ে দিল, বলল, 'বেশ—'

লোপামুদ্রার মোটর বউবাজারে একটা বাড়ির সামনে থামে। সত্যি বিভাস লোপামুদ্রা সম্বন্ধে কোন কৌতূহল মনে পোষণ করেনি। কন্তই সে দেখল, থানায় হাজতবাস থেকে সখের থিয়েটার পার্টি, রান্নার কাজ থেকে টিউশ্যানি, শেষে চায়ের দোকানের বয় হয়ে থেকে জীবন সম্বন্ধে সব কৌতূহল যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। লোপামুদ্রা কে—কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে নাই-বা জানল। আজ তার থাকবার কোন জায়গা নেই, আবার সেই ফুটপাতে পরিক্রমা সুরু হত, তার চেয়ে কোথাও একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই মিলবে, আর সাজ পোষাকে এত বড় ঘরের মেয়ে বলে তাকে মনে হয়েছে যে আশ্রয়টা তার খারাপ হবে না বলেই ধারণা। ক্লান্ত হয়ে সে মোটরের কোনে মাথা এলিয়ে দিয়ে পড়েছিল, মোটর থামার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে চাইল।

'এসো—' লোপামুদ্রা তাকে ডাকল। শীতের গাঢ় অন্ধকার চারি-দিকে। ঘন কালো রাত। আকাশে অসংখ্য তারা আর বাতাসে সুতীব্র ঠাণ্ডা। বিভাস তার অভ্যাস মতো কোটের গলার কাছটা চেপে ধরে মেয়েটির পিছন পিছন চলল।

গেটের পরে সরু ফালি রাস্তা। দুপাশে ফুলের বাগান। অন্ধকারে কিছু চেনা যাচ্ছিল না, শুধু সাদা সাদা ফুলগুলো নিথর হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছিল। রাস্তার শেষে ছবির মতো সুন্দর একটা বাড়ি। উপরের ঘরে আলো জ্বলছিল। আরো কিছুদূর আসার পর তার কানে এসে বাজল ভরাট পুরুষালি গলার একটা গান। কে যেন অত্যন্ত সুমিষ্ট গলায় গান গেয়ে চলেছে। গাড়ি বারাণ্ডার কাছে এসে বিভাস জিজ্ঞেস করল, 'কে গান গাইছেন যেন—'

লোপামুদ্রা বলল, 'আমার ওস্তাদ।'

চাপা গাড়ি বারাণ্ডার দুদিকে সিঁড়ি। একটা উঠে গেছে পূবে অপরটা পশ্চিমে। দুটো সিঁড়িতেই আলো জ্বলছে। লোপামুদ্রা পূব-দিকের সিঁড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি ওপরে উঠে ওস্তাদের কাছে গিয়ে একটু বসো, আমি কাপড় বদলে আসছি—'বিভাস ইতস্তত করছে দেখে সে হেসে আবার বলল, 'না না, ভয় পাবার কিছু নেই। আমার

ওস্তাদ খুব ভাল লোক। একা-একা গাইছে। উঠে যাও, উঠেই বাঁদিকে ঘর—'

বিভাস উঠতে লাগল লোপামুদ্রা অন্যদিকের সিঁড়ি দিয়ে অপর মহলে চলে গেল।

গানটা সত্যি বিভাসকে আকর্ষণ করছিল। ভারি মিষ্টি গলা। তাছাড়া ক্লান্তি লাগছিল খুব। ভীষণ খিদে পেয়েছে। মাথাটাও ভার-ভার লাগছে, ঠাণ্ডায় টো-টো করে ঘুরেছে বলে কিনা কে জানে শরীরটাও খারাপ লাগছে। গানের সুরে প্রাণের ভিতরটা জুড়িয়ে যাচ্ছিল। সে পা-পা করে চলে এল ঘরটির কাছে। উঁকি মেরে দেখতে পেল বেশ বড় ঘর, আর সত্যি এক ওস্তাদ-ব্যক্তি গান গাইছে। কিন্তু উনি যে বললেন ওস্তাদ একা আছেন, তা তো নয়, আসর জুড়ে বসে রয়েছে আরো চার-পাঁচজন ব্যক্তি। বিভাস উঁকি মেরে মুখটা টেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সেই দলের মধ্যে থেকে সবচেয়ে কাছের লোকটি বুঝি দেখতে পায়ঃ 'আরে, রোখ গ্যয়া কিউঁ? আইয়ে আইয়ে আইয়ে জনাব—'

বিভাস পিছু হটে যাচ্ছিল কিন্তু লোকটি উঠে এসে তাকে জোর করে ভিতরে টেনে নিয়ে গেল।

জমাট আসর। এক বুড়ো ওস্তাদ দাড়ি নেড়ে নেড়ে গান গাইছে দরবারি কানাড়ায়, আর তাকে ঘিরে বসে রয়েছে এই সাঙ্গ পাঙ্গ। এদের ভাব-ভঙ্গি মোটেই স্বাভাবিক নয়। কেউ মদ খাচ্ছে, কেউ বা বসে বসেই টলছে। দলটার সামনে অনেকগুলো খালি মদের বোতল। বিভাস খানিকটা বিমূঢ়ভাবে তাদের মধ্যে গিয়ে বসল। সঙ্গীদের মধ্যে থেকে একজন তার দিকে চেয়ে বলল, 'আরে ইয়ে তো বহুত বাচ্চা মালুম হোতি হ্যায়—'

দ্বিতীয় সঙ্গীটির বয়স কিছু বেশি, সে মদে চুর হয়েছিল, বাঙালী। সঙ্গীর কথা শুনে পাশ-বালিশ থেকে অনেক কষ্টে মাথা তুলে বলল, 'কী বাওয়া কেষ্টঠাকুর, তুমি এখানে কেন? আমি ভাবলুম বুঝি কুনোয়ার সিং।' হেঁচকিটা সামলে নিয়ে বলল, 'বাঃ চেহারাটা তো

খাসা! বেশ করেছো। এখন থেকেই পথঘাটগুলো চিনে রাখো, মুন্নাবাঈ খাসা চীজ—সারা কোলকাতা ঢুঁড়েও এমন মাল পাবে না—'

প্রথম সঙ্গীটি বলল, 'লেকিন উমর বহুত কম, পুলকবাবু। মালুম হোতি হ্যায় ভুল সে আ গ্যয়া—'

পুলকবাবুর ফের হেঁচকি উঠছিল, সেটা সামলে নিয়ে বলল, 'বাওয়া, ভুল বকছো কেন? তুমি যে ওই উমরে কত সুন্দরীর ছি-চরণে গড়াগড়ি যেতে—'

এ-লোকটার কথাবার্তা মোটে ভাল লাগছিল না বিভাসের। তার গা ঘিনঘিন করছিল। লোকটিকে দেখতেও ভাল নয়। ঢ্যাঙা, লম্বা চোবসানো গাল, চোখ বসা। মাথায় ঝাঁকড়া কাঁচা-পাকা চুল। তবলচি চটাং করে সম-এ এক জোর আওয়াজ তুলল। অর্থাৎ গান হচ্ছে, গোলমাল করছো কেন? প্রথম সঙ্গীটি পাশ-বালিশ টেনে এলিয়ে পড়ল তার উপর, পুলকবাবু কাঁপা-হাতে সিগারেট ধরিয়ে জুল-জুল করে তাকাতে লাগল ঘরের কোণের দিকে যেখানে আলু থালু বেশে ঘাড় গুঁজে শুয়ে রয়েছে একটি মেয়ে। বাইশ-তেইশ বছর বয়স হবে মেয়েটার। তার হাত-পা ছড়ানো, দেয়ালে ঠেস দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গি। পায়ে ঘুঙুর জড়ানো। চোখের কোণে সুর্মা, মুখে রঙের প্রলেপ। বুকে বাঁধা কাঁচুলি—তা থেকে খসে গেছে পাতলা ওড়না। সুউচ্চ নিটোল ভরাট বুক সামনে ঠেলে উঠেছে। পুলকবাবু সেইদিকে তাকিয়ে আছে জুলজুল করে।

বুড়ো ওস্তাদ তখন খেয়াল শেষ করে ঠুংরী ধরেছে:

> 'শামারিয়া তোরে নয়না যাদু ভারি,
> নয়নাকে তীর না মারো
> কানাইয়া মিনতি করত হাত জোড়ি—'

সত্যি বড় সুন্দর গলা বুড়োর। চমৎকার গাইছে। এ-রাগটাও বিভাসের পরিচিত। ঝিঁঝিট। বুড়োর গলা যেমনি দরাজ তেমনি তাতে কারুকাজ। একপাশ থেকে সারেংগী ছাড়ছে একজন অপর পাশ থেকে তবলা। শীতের নিস্তব্ধ রাত—গানখানা জমে গেল মুহূর্তে।

সুরার ওপর ছড়িয়ে পড়ল সুরের প্রভাব। সকলেই ঘাড় নেড়ে-নেড়ে বেতালা তারিফ জানাচ্ছিল। বিভাসও জমে গিয়েছিল। সে সম-এর মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে ফটাস্ করে একটা তাল ঠুকে বসল ফরাসের উপর। পুলকবাবুর হেঁচকি উঠছিল, সামলে নিয়ে বলে উঠল, 'বাওয়া, তুমি যে বেশ চালু ছেলে দেখছি!'

যে তিনজন এতক্ষণ কোন কথা না বলে টলে টলে উঠে বসছিল আর শুয়ে পড়ছিল তাদের মধ্যে থেকে একজন বেখাপ্পাভাবে বলে ওঠে, 'হাঁ হাঁ সব কুচ্ তো চালু হায় লেকিন চালানেওয়ালী কিধার গ্যয়ি?' পুলকবাবুরও টনক নড়ল, সে ধুয়া ধরল, 'ঠিক বাত, মুন্নাবাঈ কোথায় গেল, আঁ?' হেঁচকি উঠে কথাটাকে বন্ধ করে দিল, আবার বলল, 'সারারাত বসে বসে সেরেফ এই বুঢ্ঢার গান শুনব নাকি? বোলাও মুন্নাবাঈকো—'

ঘোঁৎ করে তবলায় একটা সম্ পড়ে। কিন্তু এবারে কোন কাজ হল না। ওরা চার পাঁচজনে এমন বেখাপ্পা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে যে থামায় কার সাধ্য। একজন একটা বোতল ছুঁড়ে ফাটিয়ে দিল মেঝেয়। টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে ভেউ ভেউ করে একজন কেঁদেই ফেলল, 'কাঁহা গ্যয়ি রে—' অপর একজন তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে নিজেও কেঁদে ফেলল। তৃতীয় জন ছিল একটু দূরে, তার নেশাটা হয়েছিল প্রবল, সে কি বুঝল কে জানে ফরাসের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ভেউ ভেউ করে কান্না জুড়ে দিল। ব্যাপার দেখে পুলক বাবুর হেঁচকি আটকে যাচ্ছিল ঘন-ঘন, সে বোতল পেটা সুরু করল একে একে। ওদিক থেকে জেগে উঠেছে সেই আধশোয়া মেয়েটি, তার নেশার ওপর বুঝি ঘোর লাগল, সে আসরের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, 'হাঁ ম্যয় ফির্ নাচুংগী—' বলে জুড়ে দিল ঝমাঝম নাচ।

হামিদ হোসেন তাজ্জব বনে' গিয়েছিল, হাঁ হাঁ করে সকলকে থামাতে গিয়ে আরও গোলমালের সৃষ্টি হল। আর আশ্চর্য, এত গোলমালেও বিভাসের চোখ দুটো যেন জড়িয়ে আসছিল ঘুমে; একটা আচ্ছন্ন ভাব

নাগপাশের মতো তার শরীর ও মন জড়িয়ে ধরছিল। ক্লান্তি ও অবসাদের সঙ্গে সে অনুভব করছিল, মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। সে বোধহীন একটা আচ্ছন্ন অনুভব নিয়ে বসেছিল চুপচাপ। আসরের মধ্যে তখন তাণ্ডব চলেছে। ওরা সকলে কোরাস ধরেছে: 'মুদ্রাবাঈ কোথায় গেল বলে'। পুলকবাবু ফটাফট বোতল ভাঙ্‌ছে আর মেয়েটি ঝমাঝম নাচছে। তবলচি বিঠলভাই বিরক্ত মুখে চুপ করে বসে আছে, রোগা সারেংগীদার সরযূপ্রসাদ গোঁফ চুমড়ে রস উপভোগ করছে, ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁ সকলকে সামলাবার চেষ্টা করছে। এই যখন অবস্থা তখন দরজার গোড়ায় দেখা দিল লোপামুদ্রা। পোশাকটা বদলে এসেছে। সাধারণ পোশাকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে এক মুহূর্তে ঘরের আবহাওয়া লক্ষ্য করল তারপর যেন ফুঁসে উঠল দারুণ রাগে: 'অ্যা-ই, অ্যা-ই, জানোয়ার, এত্‌না চিল্লাচিলি কাহে? চুপ্‌, বিলকুল চুপ্‌—'

চমকে সকলে চুপ করে যায়। লোপামুদ্রা ওদের কারোর দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে আসে হামিদ হোসেনের কাছে, জিজ্ঞেস করে তীক্ষ্ণকণ্ঠে: 'ওস্তাদ, এ-সব কী হচ্ছে? আমি তোমাকে কি বলে গিয়েছিলুম?'

হামিদ হোসেন চরম বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, মুখে হাসি টেনে বলল, 'বেটি, তুমি তো হাওড়া স্টেশনে গেলে মুন্নাবাঈকে পৌঁছে দিয়ে আসতে কিন্তু এদিকে ওরা— ওই পুলকবাবু—'

লোপামুদ্রা একবার পুলকবাবুর দিকে তাকাল, তাকে কোনো কথা না বলে গম্ভীরস্বরে ডাক দিল, 'বিঠলভাই?'

তবলচি বিঠলভাই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। এমনিতেই তাকে দেখতে মহিষাসুরের মতো তার ওপর ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরে তার বিরাট বুক ফুলে উঠল। হাত দুটো দুপাশে ঝুলিয়ে ক্ষুদে একটা গেরিলার মতো থপ্‌ থপ্‌ করে পা ফেলে উঠে এসে দাঁড়ায় লোপামুদ্রার সামনে, যেন একটা অনুগত দৈত্য: 'মুদ্রাবাহিন?'

'সাফ করে দাও এই জঞ্জাল—'

বিঠলভাইকে ডাকার অর্থ সকলেই বুঝেছিল কিন্তু ওরা তখন নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। এত সহজেই যদি চলে যাবে তাহলে এসেছিল কেন? কেউই উঠতে চায় না। লোপামুদ্রার পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদে। বোতলের দিব্যি করেঃ লোপামুদ্রার একটা নাচ দেখেই তারা চলে যাবে। এমন টুটাফুটা দিল নিয়ে বিদেয় হলে তারা আর বাঁচবে না, রাস্তাতেই মরে পড়ে থাকবে। তার চেয়ে লোপামুদ্রা নাচুক, বেহেস্তের হুরীর নাচ দেখে নিজেরাই চলে যাবে। কিন্তু লোপামুদ্রার একেবারে মেজাজ ছিল না, সে আবার বিঠলভাইকে ডাকল। খানিকটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হল। বিঠলভাই এক-একটাকে পুতুলের মতো তুলে বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এল। গোলমাল করল পুলকবাবু। সে কিছুতেই যাবে না। লোপামুদ্রার নাচ তো দেখবেই, আজ রাত্তিরে থেকেও যেতে চায়। টাকা তার সঙ্গে আছে, যা লাগে দেবে। সে—কথায় কোন কর্ণপাত না করে লোপামুদ্রা এক প্রচণ্ড ধমক দিল বিঠলভাইকে: 'কী দেখছো হাঁ করে, বেহুদা বুড়ো মাতালকে টেনে বার করে দিয়ে আসতে পারছো না গেটের বাইরে?' পুলকবাবু যেন ক্ষেপে গেল। কিন্তু তার আগেই বিঠলভাই তাকে কোলপাঁজা করে তুলে বার করে দিয়ে এল গেটের বাইরে।

আসরটা থমথম করতে লাগল।

লোপামুদ্রা বলল, 'আমি বারণ করে গেলুম, তবু জানোয়ার-গুলোকে ঢুকতে দিলে কেন?'

হামিদ হোসেন চুপ করে রইল।

বিঠলভাই বলল, 'মুদ্রাবহিন, ওস্তাদজীর কোন দোষ নেই। ওই ভদ্রা সকলকে ডেকে বসিয়েচে মদ গিলিয়েচে, নিজেও গিলেচে, এখন ছাখো বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। সব দোষ ওই ভদ্রার—'

লোপামুদ্রাকে দেখেই তুঙ্গভদ্রা নাচ থামিয়ে দিয়ে ফের দেওয়ালের কোনে আশ্রয় নিয়েছিল। বেহুঁস হয়নি, চোখ পিট পিট করে ঘরের আবহাওয়াটা লক্ষ্য করছিল। বিঠলভাইয়ের অভিযোগ শুনেই সে ফোঁস করে উঠল, 'তুই থাম্ মোটা হাতি। পুলকবাবু আসতে চাইল তো আমি কি করব—'

লোপামুদ্রা দারুণ রাগে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বলল, 'যা দূর হ' আমার সামনে থেকে। নিজের ঘরে যা—'

ঘাড় গোঁজ করে তুঙ্গভদ্রা পিট পিট করে বিঠলভাইয়ের দিকে তাকায়। ভীষণ একটা আক্রোশে তার চোখের মণি দুটো জ্বলে। বিঠলভাই তবলাটা টেনে নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে। তুঙ্গভদ্রা আর কোন কথা বলে না, রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে চলে যায় নিজের ঘরের দিকে। ঘরের বাইরে বারাণ্ডায় ঝম করে ওর পা পড়তেই বিঠলভাই তবলার কানিতে একটা মিঠে আওয়াজ তোলে—ঠুং!

ঘরটা শান্ত হয়ে যায় আবার। মদের বোতল ইতস্তত ছড়ানো, তাকিয়া ফরাস এলোমেলো। লোপামুদ্রার নজরে পড়ে, বিভাস মাথা গুঁজে পড়ে রয়েছে ফরাসের উপর। মাথা তুলে আর বসে থাকতে পারেনি বিভাস। অসহ্য মাথার যন্ত্রনার সঙ্গে তার এসে গিয়েছিল জ্বর। কোন জ্ঞান নেই। বিঠলভাই তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গেল ও-মহলের একটা ঘরে। রাত তখন দেড়টা।

সকালে কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞান এসেছিল বিভাসের। চোখ মেলে দেখতে পায় সাজানো-গুছানো একটা ঘর আর মাথার কাছে উদগ্রীব একজোড়া চোখ। সে-চোখ যেন মমতায় ঝুঁকে রয়েছে তার মুখের উপর। কি যেন বলল সে দুচোখের অধিকারিনী, বিভাস কিছু বুঝল না। সে আবার চোখ বন্ধ করল। আচ্ছন্ন চেতনা। মাথার যন্ত্রনা আর সারা গায়ে জ্বর। ইলিবিলি ছবি ফুটছে তার চোখের সামনে। কাকা যেন আছাড় মারছে সেতারখানা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে, সে চিৎকার করে উঠলো' 'না না সেতার আমাকে ফিরিয়ে দাও, ভেঙো না ভেঙো না কাকা—' দারুন ছটফট করল সে, হু হু করে কাঁদল। মাথার কাছের মুর্তিটাকে জড়িয়ে ধরে সে আকুলভাবে কেঁদে উঠে বলল, 'কাকা, আমার সেতার ফিরিয়ে দাও, আমার সেতার ফিরিয়ে দাও—'

আবার জ্ঞান হারালো সে। আবার চোখ মেলে চাইল বেঘোর জ্বরে যে কত কী দুস্বপ্ন দেখল। অবচেতনার স্তর থেকে নানা ছবি ফুটে উঠতে লাগল নির্জন ঘরের মধ্যে। কখনো সে দেখল ফাটকে বন্দী হয়ে রয়েছে, ইনেস্পক্টর সাহেব তাকে জুলুম করছে, কখনো র্ঁাধছে—রাজকুমার সেজেছে এক সখের থিয়েটারে, প্রাণকেষ্টদা তাকে খেতে দিচ্ছে, সে মনের আনন্দে খাচ্ছে। মাথার কাছে সেই এক জোড়া চোখ অপলক স্থির। বিভাস মুখ তোলে, বলে, 'জানেন, আমি সেতার বাজাতে জানি!' তারপরই যেন আতংকে ডুবে যায় বিভাসের গলা: মিনতি করে বলে, 'সুরমাদি, আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?—চলুন নীচে যাই—' লোপামুদ্রা ওর মাথায় আইস-ব্যাগ চাপায়, ডাক্তার আসে, পরীক্ষা করে চলে যায়। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেয় লোপামুদ্রা, বিভাস ক্লান্ত হয়ে ঘুমোয়।

ভোরের দিকে তার চিৎকার শুনে আবার ছুটে আসে লোপামুদ্রা। বিভাস ভয়নক অস্থির হয়ে বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে আর চেঁচাচ্ছে, 'না, আমি চুরি করিনি। 'না, আমি চুরি করিনি!' লোপামুদ্রা ওর পাশে গিয়ে বসতেই বিভাস ওর কোলে মুখ গুঁজে হু হু করে কেঁদে উঠল, 'দিদি'আমার সেতারের টাকা ওরা কেড়ে নিয়েছে; আমি এখন

সেতার কিনি কি করে?' লোপামুদ্রা ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'তুমি ঘুমাও বিভাস। আমি কিনে দোব—'

বিভাস যে কদিন বেহুঁস জ্বরের মধ্যে ছিল সেই কদিন এই রকম আবোল-তাবোল বকেছে। কিছুই জ্ঞান-গম্যি ছিল না তার। সেরে ওঠার পর বলল, 'দিদি, খুব ভোগালুম তোমাকে!'

লোপামুদ্রা বলল, 'ভুগলে তো তুমি। যা ভাবিয়ে তুলেছিলে। যত-না ভুগেছো তার চেয়ে বেশি যা তা বকেছো—'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

বিভাস হেসে চুপ করে থাকে। লোপামুদ্রা খাবার এগিয়ে দেয়। খেতে খেতে বিভাস বলে, 'তোমার খুব ভাবনা হয়েছিল, তাই না দিদি?'

লোপামুদ্রা ওর পাশে বসে হেসে বলে, 'হবে না? কোথাকার এক পথে-কুড়োনো ভাই, ওষুধ খাবে না চুপ করে শুয়ে থাকবে না, খালি আঁৎকে ওঠা আর আবোল তাবোল বকা—'

বিভাস বলে, 'আমার কিন্তু বেশ মনে আছে যতবার জ্ঞান হয়েছে ততবারই মাথার কাছে তোমাকে বসে থাকতে দেখেছি। আমার সত্যিকারের দিদিও এমন করত কিনা সন্দেহ।'

ধমক দেয় লোপামুদ্রা: 'থাক্ থাক্ খুব হয়েছে। এবার খেয়ে নাও।'

বিভাস বলে, 'আচ্ছা দিদি, এবার তো আমি একটু উঠে হেঁটে বেড়াতে পারি—'

'পারো।' লোপামুদ্রা বলে, 'তবে বাগানের বাইরে যেও না।'

অসুখে ভুগে আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘরের ভিতরটা বিভাসের আর ভাল লাগছিল না। সে সকালে সন্ধ্যায় উঠে হেঁটে বেড়াতে থাকে। সিঁড়ির উপরেই তার ঘর। বিভাস নেমে আসে সিঁড়ি দিয়ে। গাড়ি বারাণ্ডার পরে সরু রাস্তার দুপাশে সুন্দর বাগান। প্রথম দিন রাত্রির অন্ধকারে কিছুই দেখা যায়নি কিন্তু চমৎকার ফুলের গাছ রয়েছে বাগানে। মালী যত্ন করে এক একটি বেড রচনা করেছে, বিকেলে নিয়মিত জল দেয়। ছোট ছোট একটি দুটি লোহার গেট, আর মাথার উপর কোনটাতে

অপরাজিতা কোনটাতে কুঞ্জলতা কোনটাতে মর্ণিং গ্লোরি। বেড়ার গায়ে চার্চ বেল আর ডেইজি। বাগানের ভিতর বসবার জন্যে হেলান দেওয়া কাঠের বেঞ্চ। অদ্বৈত মালী বাগানে জল দেয়। কোথাও তারামণি-যূথিকা ফুটেছে থোকা থোকা, কোথাও রজনী গন্ধার ঝাড়। কোন-কোন বেডে ঝাঁক ঝাঁক চন্দ্রমল্লিকা, কোথাও বা বড় বড় ডালিয়ার ডালি। ছোট ছোট বেডে তারার মতো এখানে-ওখানে ছিটানো বিভিন্ন রঙের কসমস, তাদের গায়ে গায়ে কলাবতী বেলফুল আর সন্ধ্যামালতী। রাস্তার অপর দিকের বাগানে যত সব বিদেশী ফুল। তার মধ্যে গোলাপের সংখ্যাই বেশি—বিভিন্ন আকারের আর বিভিন্ন রঙের গোলাপ। বসরাই প্রিমরোজের সঙ্গে ছোট ছোট ঘোর লাল টেবল্ পর্য্যন্ত। গোলাপ বেডের ওপর লোপাপামুদ্রার নিজেরও একটা বিশেষ যত্ন আছে। তাছাড়া নার্সিসাস নস্টারসিয়াম সুইট পী—আরো কতো রকমের ফুল আছে ওদিকের বাগানে বিভাস সব জানেনা। অদ্বৈত-মালীকে জিজ্ঞেস করে-করে মোটামুটি এই কটি নাম সে জেনেছে। শীতের সকালে ও সন্ধ্যায় বাগানটিকে তার ভারি সুন্দর লাগে।

কোনদিন বই নিয়ে এসে বসে বাগানের বেঞ্চে। একমনে পড়ে। অসুখের সময় থেকেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে সময় কাটাবার অবলম্বন হিসেবে বইয়ের কথা প্রথম সে তোলে। চাকর গঙ্গাধর বই এনে দিত। অলসভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে বইয়ের পাতা ওলটাত আর তার দৃষ্টি চলে যেত বহুদূর অতীতে। ঘরের ভিতর থেকে জানালার বাইরে তাকালে তার নজরে পড়ত লাল ফুলে ভরা দুটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ। কৃষ্ণচূড়ার গাছ বাগানটিকে ঘিরে বাড়ির চারপাশেই রয়েছে। সেইদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে দেখতে পেত তাদের গ্রামের বাড়ির পাশের তাল সুপুরি আর খেজুর গাছের সারি। দেখতে পেত আতা নোনা আর ফলসা গাছের ঝোপ। সেই ঝোপের তলায় সহপাঠীরা বুঝি বই খুলে বসেছে। সহপাঠীরা কেউ বই পড়ছে, কেউ গুলিভাণ্ডা খেলছে, কেউ বা গল্পগুজব করছে। কিন্তু সকলেরই আসল লক্ষ্য ইস্কুলের পড়া। বিভাস শুয়ে শুয়ে সেই সব ছবি দেখত আর তার মনের কোণে বাসনা জাগত সে যদি

আবার লেখাপড়াটা সুরু করতে পারত। তার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে লোপামুদ্রা একদিন কথাটা তোলে। তারপর থেকে বাক্সে বই না এসে তার পাঠ্যপুস্তক আসতে থাকে। সেই সঙ্গে একজন মাষ্টার। বিভাস প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবার জন্যে তৈরী হতে লাগল।

অনেকদিন লেখাপড়ার সঙ্গে তার কোন সংশ্রব নেই। প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সব। নতুন করে সেগুলো ঝালিয়ে নিতে লাগল বিভাস। ও-মহলের সঙ্গে এ-মহলের প্রায় কোন সম্পর্কই নেই। সন্ধ্যা পার হয়ে গেলে এ-মহলটা একেবারে নিঝুম হয়ে যায়। লোপামুদ্রা চলে যায় আসরে, তুঙ্গভদ্রা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে ঝুমঝুম আওয়াজ তুলে তার ঘরে উঁকি মেরে আসরে গিয়ে উঠে। বিঠলভাই চলে যায়, ওস্তাদ হামিদ হোসেন গিয়েও জমে। ফাঁকা হয়ে যায় এ মহলটা। বইয়ের পাতা খুলে মনোযোগ দিয়ে পড়বার অবকাশ মেলে। কিন্তু সবদিন বিভাস মনোযোগ দিতে পারে না। একটু বেশি রাত হয়ে গেলে তার যখন ক্লান্তি লাগে সে উঠে এসে দাঁড়ায় সিঁড়ির রেলিঙের কাছে। রেলিঙের উপর ঝুঁকে পড়ে অন্ধকারে-তাকিয়ে থাকে-ফুলেঘেরা বাগানটার দিকে। কোন ফুলগাছকেই চেনা যায় না এতদূর থেকে। তবু সে আন্দাজে নিজের মনে-মনে বলে, 'ওইটা তারামনি-যূথিকা, ওইটা রজনীগন্ধা,...চন্দ্রমল্লিকা, সূর্যমুখী...' ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে ওকে যেন আরো নিথর করে দেয়। এমনি সময় সে শুনতে পায় ও-মহলে গান জুড়েছে ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁ—তার ভরাট গলায় রাত্রি যেন থরথর করে কেঁপে উঠছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে এ-মহলে চলে আসে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পায় ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁ চোখ বুজে এক বিশেষ ভঙ্গিতে ধরেছে পুরিয়া কল্যাণ, তার একপাশ থেকে তবলা বাজাচ্ছে কালো গোরিলার মতো ভীষণাকৃতি বিঠলভাই আর অপর পাশ থেকে সারেংগী ছাড়ছে রোগা লম্বা চালুশ সরযুপ্রসাদ। গান হয়ে যায়, তুঙ্গভদ্রা নাচে। ওর সঙ্গে তবলা বাজায় বিঠলভাই। বড় মিঠে হাত লোকটার, অপূর্ব বাজায় তুঙ্গভদ্রার নাচের সঙ্গে। আবার গান হয়। শেষে ওঠে লোপামুদ্রা। নাচবার মতো

বয়স আর নেই লোপামুদ্রার, কিছুক্ষণ নেচেই হাঁপিয়ে পড়ে, নাচতে বলে তুঙ্গভদ্রাকে। নাচের ব্যাপারে কোন ক্লান্তি নেই তুঙ্গভদ্রার, সে নেচে চলে। লোপামুদ্রা শোনায় গান। অপূর্ব গলা। বিঠলভাইয়ের সঙ্গত যেন জমে ওঠে।

রাত হয়ে যায় অনেক। বিভাস ফিরে এসে গুম হয়ে বসে থাকে নিজের ঘরে। গঙ্গাধর খাবার দিয়ে যায়। খায় না বিভাস, চুপ করে ভাবে। একটা জমাট সঙ্গীতের আবহাওয়ায় সে এসে পড়েছে অথচ এতদিনেও সেখান থেকে কিছু আহরণ করতে পারল না। মনটা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আবার ভাবে, সময় একেবারে যায়নি। যেমন করে হোক এখানে সে পড়ে থাকবেই। লোপামুদ্রা বলেছে, মাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে সে ওকে সঙ্গীতের জগতে ঢুকিয়ে দেবে। এখন দিন-কতক গানের কথা না ভেবে লেখাপড়ার কথা ভাবলেই লোপামুদ্রা খুশি হবে। বিভাস আবার বই টেনে নেয়, পড়তে বসে।

আগে খুব ভোরে উঠতে পারত না বিভাস। লেখাপড়ার টানেই কিছুদিন থেকে সে ভোরে-ভোরে ওঠে। বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। কলতলায় সামান্য সাড়া জাগে। প্রথম প্রথম সে তেমন খেয়াল করেনি তারপর ভাল করে কান পেতে শুনতেই মনে হল কোথা থেকে যেন সেতারের শব্দ ভেসে আসছে। এ-বাড়িতে সেতার বাজে কোথায়? বিভাস দারুণ আশ্চর্য হয়। সেই আশ্চর্যের টানে পায়ে-পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সে পার হয় এ-মহল, ঘরে ঘরে ঘুমুচ্ছে সবাই। ও-মহলের মাঝামাঝি জায়গায় ছোট সরু একটা সিঁড়ি—উঠে গেছে ত্রিতলে। সেখানে কোন ঘর নেই, শুধু একটা চিলে-কোঠা। পায়ে পায়ে উঠল বিভাস, তারপর আরো আশ্চর্য হয়ে দেখল সেই বুড়ো ওস্তাদ হামিদ হোসেনখাঁ ধ্যান নিমীলিত নেত্রে সেতারে আলাপ করছে রাগ ভৈরবের। এ কী আলাপ! এ কী সুর! দুচোখে জলের ধারা নেমেছে, সুরে সুরে বুড়ো ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁ যেন নিজের অন্তর উজাড় করে দিচ্ছে। বাদকের এমন রূপ বিভাস কোনদিন দ্যাখেনি, তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বাজনা থামতেই

বিভাস তার পায়ে উপুড় হয়ে পড়ল: 'ওস্তাদজী, আমাকে এই বাজনা শেখাও।'

ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁ প্রসন্ন চোখে ওর দিকে তাকাল, বলল, 'বেটা, এ-বাজনা তো শেখানো যায় না! তবে তোমাকে আমি সেতার শেখাব, মুদ্রা-বেটি আমাকে বলেছে। তোমার পরীক্ষাটা হয়ে যাক—'

বিভাস বলল, 'পরীক্ষা আমি দোব না। আমি সেতার শিখব।'

হামিদ হোসেন হেসে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'বেটা সেতারের জন্যেই তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে। আরো বেশী লেখাপড়া শিখতে হবে। সঙ্গীত শুধু শিখলেই হবে না, সঙ্গীতকে আবিষ্কার করতে হবে শাস্ত্র ঘেঁটে। মুদ্রা বেটি তোমার ওপর অনেক আশা রাখে—'

লেখাপড়ার এই একটা নতুন মূল্য তার চোখে ভেসে ওঠে। লোপামুদ্রা এখনো তাকে সেতার কিনে দিচ্ছে না কেন কথাটা ভাবতে ভাবতে কতদিন তার মন অভিমানে ভরে উঠেছে,—আজ বুঝল তার সত্যিকারের অর্থ। তার মন আবার দৃঢ় হয়ে ওঠে। দ্বিগুণ উৎসাহে লেখাপড়ায় মন দেয়। মাষ্টার মশাই বিস্মিত হন তার নিষ্ঠা এবং আগ্রহ দেখে। তিনি আসেন সকালবেলা। চলে যাবার পরও বিভাস অনেকক্ষণ পড়ে। আস্তে আস্তে ঘুম ভাঙে এ-বাড়ির। লোপামুদ্রা ওঠে, ওকে পড়তে দেখে নিচে নেমে যায়। বিভাস মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকে। ওর মনোযোগ ভেঙে যায় ঘরের দরজার কাছে একটি মূর্তিকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। একটু অস্বস্তি বোধ করে। তারপর নিজে থেকেই বলে, 'কী ভদ্রাদি, কিছু বলবে?' তুঙ্গভদ্রা বিলোল ঠাটে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওকে শুধু ছাখে। প্রশ্ন শুনে ওর চোখ দুটোয় কেমন একটা অদ্ভুত প্রভায় জ্বলে ওঠে। বলে, 'মুদ্রাদিদি উঠে পড়েছে, পরে আসব।' তার খানিকক্ষণ পরে বিঠলভাই-য়ের ঘর থেকে শুনতে পায় তুঙ্গভদ্রা সেখানে নাচছে আর তুমুলভাবে তবলা বাজাচ্ছে মোটা বিঠলভাই। বিভাসের ইচ্ছা আছে বিঠলভাইয়ের কাছে তবলা শিখবে। হামিদ হোসেন যদি তাকে সেতার শেখায় তাহলে ওরই কাছ থেকে গান আর বিঠলভাইয়ের কাছ থেকে তবলা

শিখে সে তার প্রাণের আকাঙ্খা চরিতার্থ করবে সকল দিক দিয়ে। মুদ্রাদিদি তো আছেই।

ম্যাট্রিক পাশ করল বিভাস। খবরের কাগজে তার রোল-নাম্বার দেখে আনন্দে হৈ হৈ করতে করতে বাড়ী ঢুকল। লোপামুদ্রা বলল, 'বসো, তোমার এই পাসের খবর শুনে আমি একটা পুরস্কার দোব।'

বিভাস বসে রইল। লোপামুদ্রা একটা কারুকাজ-করা সুন্দর সেতার এনে ওর হাতে তুলে দিল, বলল, এই নাও। এবার আমার সঙ্গে চলো ওস্তাদের কাছে—'

বিভাস আনন্দে উত্তেজনায় কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না। তার চোখে জল এসে গেল। বারবার সেতারটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর ওর সঙ্গে চলল ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁর কাছে। প্রথামত হামিদ হোসেন তার হাতে নাড়া বেঁধে দিল। বিভাসের মন ভরে উঠল প্রগাঢ় আনন্দে।

সে বলল লোপামুদ্রাকে, 'দিদি, আমি আরো পড়ব। পড়ব আর সেতার শিখব।'

লোপামুদ্রা বলল, 'বেশ তো ভর্তি হয়ে যাও কলেজে।'

বিভাস ভর্তি হয় রিপন কলেজে। তার প্রাণের মধ্যে একটা নতুন আবেগের সঞ্চার হয়েছে। সে কলেজে যায় আর ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁর কাছে সেতার শেখে। তার ইচ্ছে হয় সেতারের সঙ্গে সঙ্গে গানও শেখে। কিন্তু বলতে সাহস পায় না। হামিদ হোসেন খাঁই একদিন তাকে কণ্ঠসঙ্গীতের কথা বলল, বলল, 'বেটা, যন্ত্রসাধনার সঙ্গে কণ্ঠ সাধনা না করলে চলে না। ভাল সুরজ্ঞ না হলে ভাল যন্ত্রসাধক হওয়া যায় না। তোমাকে গানও শিখতে হবে—'

বিভাস বলল, 'আমি শিখব ওস্তাদজী।'

হামিদ হোসেন বলল, 'লোপামুদ্রার কাছে গান শেখো তুমি। মুদ্রা-বেটির কাছে অনেক আছে—,

কথাটা লোপমুদ্রার কাছে বলতেই লোপামুদ্রা হাসল। বলল, 'কার

কাছে কত কী আছে তা তুমি পরে টের পাবে। তবে আমি তোমাকে শেখাব। ওস্তাদজী বড় চালাক লোক—'

সুতরাং বিভাস মনের আনন্দে একজনের কাছে গান শেখে অপর-জনের কাছে সেতার। এমনিতে ওর গলা খারাপ নয়, তান্ত্রিক—সাধুর কাছে তার পত্তন ভালই হয়েছিল। তান্ত্রিক—সাধুও কখনো-কখনো গলা ছেড়ে গান ধরত, আর তাঁর সঙ্গে গাইতে বলত। আর, সেতারে সে তো বহুদূর এগিয়ে ছিলই। ঠিক লোকের পাল্লায় পড়ে তার গলা আর হাত দুটোরই উত্তরোত্তর উন্নতি হতে লাগল। ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁর উভয় দিকেই দৃষ্টি। কিন্তু অন্য যেটা বাকি ছিল একটু একটু করে বিভাস সেদিকেও এগোল। বিঠলভাইয়ের সঙ্গে তার আলাপ জমে গিয়েছিল আগেই। ভীষণাকৃতি চেহার বটে, কিন্তু মনটি বড় কোমল, বড় ভাল। অমন একটা ভয়নক চেহারার মধ্যে এই রকম একটা শান্ত সরল মন কি করে থাকতে পারে অনেক দিন ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা পায়নি বিভাস। অথচ লোকটা জাত-গুণ্ডা। হুকুম পেলে নির্দ্বিধায় ছোরা চালাতে পারে সে, আবার যখন তবলা নিয়ে বসে তখন অন্য মানুষ। ওকে ভয় করে না এমন লোক খুব কম আছে আবার ওকে ভালবাসে না এমনলোক পাওয়া দুষ্কর। একহাতে খুন অপরহাতে সঙ্গীত —মৃত্যু আর জীবনকে নিয়ে লোকটা বড় স্বচ্ছন্দে চলা ফেরা করে। এ বাড়ির একান্ত প্রয়োজনীয় লোক সে। বিঠলভাই আছে বলেই সকলে এত নির্ভয়।

কথা বলে' আরো অবাক হয়েছে বিভাস। লোকটাকে দেখে প্রথম-প্রথম সে এগোতে চায়নি কিন্তু আলাপ হয়ে যাবার পর দেখল আশ্চর্য সরল আর নিরীহ প্রকৃতির লোক সে। একটা উদার দিল্ রয়েছে তার। সবাইকে সে অন্তর দিয়ে ভালবাসে। বিশেষ করে লোপামুদ্রার প্রতি একটা অদ্ভুত আনুগত্য আছে। লোপামুদ্রার জন্যে জান্ কবুল করতে রাজি। আর ওস্তাদ হামিদ হোসেনকে সে গুরুজীর মতো ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। শুধু তুঙ্গভদ্রার কথায় সে চুপ করে থাকে। না-উচ্ছ্বাস না-অনুরাগ কোন কথাই সে ব্যক্ত করে না বরং বিভাস লক্ষ্য করেছে

তুঙ্গভদ্রার কথা উঠলে অমন ভয়নক চেহারার লোকটা কেমন অসহায় হয়ে পড়ে, মুখে কোন কথা ফোটে না। 'আমাকে তবলা বাজাতে বলে, আমি ওর সঙ্গে বাজাই আমার তবলা কেমন লাগে বিভাস-ভাইয়া ?'

বিভাস বুঝল এই সুযোগ। সে বলল, 'খুব ভাল লাগে বিঠলদা। তুমি আমাকে তবলা শেখাবে ?'

বিঠলভাই হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল বিভাসের মুখের দিকে। তারপর বলল, 'আরে বাপস্ তুমি ওস্তাদ জীর কাছে সেতার শিখছো, মুদ্রাবহিনের কাছে গান শিখছো—ওরা বহুৎ গুণী ব্যক্তি, আমি তবলার কতটুকু জানি, তোমাকে আমি কী শেখাব। আমি ছিলুম গুণ্ডা, মুদ্রাবহিন আমাকে নোকরি দিয়ে এখানে আনে তবলা জানতুম একটু আধটু, ওস্তাদজী আমাকে তালিম দিয়ে বাজাবার সাহস দিয়েছে। তুমি শিখতে হলে ওস্তাদজীকে বলো, বহুৎ ভারি গুণী আদমি ওস্তাদজী—'

তাকে তবলা শেখাতে বিঠলভাইয়ের বড় সংকোচ। সেদিন সুবিধে করতে পারল না বিভাস। আকাঙ্খাটা তুলল ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁর কাছেই। তাল লয় মাত্রা সম্বেন্ধ ভাল করে অবহিত না হলে সঙ্গীতের জ্ঞান সম্পুর্ণ হয় না—ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁ কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিল তাকে। সেই সূত্র ধরেই কথাটা উঠল। বিঠলভাই ছিল পাশেই। বিভাস জানাল তার তবলা শেখার আকাঙ্খা। হামিদ হোসেন চোখ তুলে চাইল বিঠলভাইয়ের দিকে। বিঠলভাই অধোবদন। হামিদ হোসেন বলল তাকে 'হাঁ, তুমি ওকে শেখাও তবলা। এতে সংকোচের কী আছে। তুমি যা জানো খুব কম লোক তা জানে।'

বিঠলভাই কোন কথা বলতে পারল না। সেই থেকে বিভাস সুরু করল তার কাছে তবলা শিখতে। তার সময় একেবারে ঠাসবুনোন। কোনদিকে চাইবার অবকাশ নেই। ভোরে উঠে সেতার নিয়ে বসে সে, বিকালে গান আর তবলা। হু হু করে সময় কেটে যায়। লোপামুদ্রা সত্যিই যে অনেক-কিছু জানে তা সে একটু একটু করে বুঝতে পারে: বড় সুন্দর গলা লোপামুদ্রার; রাগ-রাগিনীর রূপ যেন স্বরে স্বরে ফুটিয়ে তোলে। তার সঙ্গে আরো বিস্তৃত আলোচনা জুড়ে দেয় ওস্তাদ হামিদ

হোসেন খাঁ। একই রাগ কণ্ঠে আর সেতারে সমান দক্ষতায় তুলতে থাকে বিভাস। ওর মনের ভিতরটা যেন ভরে ভরে ওঠে। একটা অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হয় ওর মনে। তেমনি তবলাতেও তৈরি হয় সে। বিঠলভাই ওকে তার নিজের ঘরে নিয়ে এসে একের পর এক পাঠ দেয়, আর খুশি হয়ে বলে, 'হাঁ বিভাস-ভাইয়া, একদিন তুমি পাকা তবলচি হবে' —'খাটে, প্রচুর খাটে বিভাস। বিঠলভাইয়ের সঙ্গে তার জমেও মন্দ না। দুজনেই দিল খুলে গল্প করে। ওর সঙ্গে বিভাস কেমন একটা একাত্মীয়তা বোধ করে। তবু মাঝে মাঝে বিঠলভাইকে তার কি-রকম একা অসহায় মনে হয়। গল্প করতে করতে বিঠলভাই মাঝে-মাঝে চমকে ওঠে, 'কেউ বুঝি এল!' মুখে বলে না সে কিন্তু আকুল ভাবে দরজার দিকে তাকায়। বিভাস ওর মতিগতিকে বুঝতে পারে না, ওর অস্থিরতাকে চিনতে পারে না। কিন্তু খানিক পরেই সে ঘুঙুরের আওয়াজ শুনতে পায়। ওপাশের ঘর থেকে ঝুমঝুম ঘুঙুরের আওয়াজ তুলে তুঙ্গভদ্রা এসে ঢোকে। রোগা, পাতলা শরীর। কাঁচুলি-আঁটা কিন্তু সুউচ্চ বুক। এত উঁচু যে অশোভন ভাবে চোখে পড়ে। বিঠল ভাই তবলাটা টেনে নেয়। বিভাসের মনেহয় বিঠলভাই তবলা বাজাচ্ছে না নিজেকে পিটছে। অতি ভয়ানক ভাবে তবলাটাকে আঁকড়ে ধরে বিঠলভাই!

অথচ মোটা বিঠলভাইকে কোন আমলই দেয় না তুঙ্গভদ্রা। বরং ব্যঙ্গ করে 'হাতি' বলে। 'মোটা হাতি' বললে ওর মনে বেশ লাগে— সেদিন আসরে বসে বসে গল্প করতে করতে বিভাস লক্ষ্য করল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, শেষ গ্রীষ্ম। গরমের সঙ্গে আসন্ন বর্ষার ছিটে—বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আবহাওয়া। আসরে বসে হামিদ হোসেন গাইছিল বাগেশ্রী বিঠলভাই বাজাচ্ছিল তবলা। তখনো কেউ এসে জোটেনি। গানটা হয়ে যাবার পর হামিদ হোসেন তাকে বলল ওই রাগটা সেতারে বাজাতে। বিভাস বাজিয়ে শোনাল। তার পর হচ্ছিল গল্প। এমন সময় পিছনের দরজা খুলে উঁকি মারল তুঙ্গভদ্রা : 'আমি আসব ওস্তাদজী?'

তুঙ্গভদ্রা আসা মানেই নাচ। বিঠলভাই তবলায় একটা টুং করে আওয়াজ তুলে বলল, 'হাঁ হাঁ আ যাও—'

একেবারে সাজ সজ্জা করেই এসেছে তুঙ্গভদ্রা। এক-বেনী চুল সাপের মতো পিঠে ছড়ানো, চোখের কোলে সূক্ষ করে টানা সুর্মা, ঠোঁটে লাগিয়েছে লাল পালিশ। বুকে টান করে বাঁধা কুঁচুলি, তার উপরে পাতলা ওড়নার স্বচ্ছ আবরণ, সুউচ্চ বুক দুটি ঠেলে উঠেছে সামনে। পরনে জরিদার সিল্কের ঘাঘরা; পায়ে ঘুঙুর। তার হাতে পানের ট্রে সিগারেটের কৌটা ছিল অতিথি অভ্যাগতদের জন্যে। সেগুলো রেখে তুঙ্গভদ্রা জবাব দিল বিঠলভাইয়ের কথার: 'তুম চুপ রহো মোটাহাতি, তুমসে কৌন পুছনে গয়ি বুদ্ধু কাঁহাকা—'

বিঠলভাইয়ের মেজাজটা গোড়া থেকেই বেশ ভাল ছিল কিন্তু উপর্যুপরি 'মোটা হাতি' আর 'বুদ্ধু কাঁহাকা' শুনে একে বারে খচে গেল। মুখে কিছু না বলে তবলাটা ঠেলে সে একপাশে বসে রইল চুপ করে। তুঙ্গভদ্রা নাচতে সুরু করেই থেমে পড়ে বলল, 'তব্‌লে বন্ধ্ কিঁউ?' তারপর বিঠলভাইয়ের দিকে চোখ পাকিয়ে চেয়ে বলে, 'বাজাওগে নেহি?'

বিঠলভাই সেই যে হাত উঠিয়ে একপাশে সরে বসেছিল তারপর আর তবলা ছোঁয়নি। সে নির্বিকারভাবে জবাব দিল, বুদ্ধুলোক পেতিন-কো সাথ সঙ্গত নেই করতা। খুশি হো তো খোদ তব্‌লে বাজাও আউর নাচো—'

রাগের মাথায় তুঙ্গভদ্রা হয়তো পায়ের ঘুঙুর খুলেই ছুঁড়ে মারত কিন্তু ঠিক সেই সময় ওস্তাদজীকে আদাব জানাতে জানাতে সরযুপ্রসাদ ঢুকল। সরযুপ্রসাদ সারেংগী বাজায়। রোগা। চোবসানো গাল। বসা চোখ। চোখে ধূর্তামি। বিঠলভাইয়ের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট হবে। কিন্তু বড়ই সৌখীন। সর্বদা ফিটফাট। চুড়িদার আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে, পরনে মিহিসুতোর কোঁচানো ধুতি। মাথায় লম্বা টেরি আর প্রজাপতি উড়ু উড়ু গোঁফ। সে পেশাদার সারেংগী বাদক।

তাকে ঢুকতে দেখে তুঙ্গভদ্রার চোখে যেন শান্তি নামল: 'এই যে সরযূভাই আমার সঙ্গে একহাত তবলা বাজাও তো।' তারপরে বিঠলভাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, 'মোটা হাতির দেমাক হয়েছে—'

সরযূপ্রসাদ এক নিমেষেই ঘরের আবহাওয়াটা বুঝে নিল। সে বুদ্ধিমান লোক। প্রজাপতি উড়ু উড়ু বাহারে গোঁফে একবার তোয়াজী হাত বুলিয়ে সে টেনে নিল তবলা, তুঙ্গভদ্রা জুড়ে দিল নাচ। বিঠলভাই উঠে বাইরে চলে গেল।

তুঙ্গভদ্রা এখন উদ্দামবেগে নাচবে, সে নাচ ছাড়া অন্য কিছু জানে না। তারপর একে একে সবাই এসে জুটবে। জমে উঠবে আসর। কিন্তু বিঠলভাই বোধহয় আজ আর তবলা বাজাতে পারবে না। তার মনে খুব আঘাত লেগেছে। সরযূপ্রসাদ এমন কিছু তবলা বাজাতে পারে না, বিঠলভাইয়ের সামনে তবলায় হাত দিতে সে সাহসই করে না, সেই সরযূপ্রসাদের সামনে তাকে চরম অপদস্থ করল তুঙ্গভদ্রা। বাইরে রেলিঙের উপর ভর দিয়ে বিঠলভাই বিষণ্ণভাবে সেই কথাই ভাবছিল। বিভাস তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর বিভাসই বলল, 'বিঠলদা, তুমি তবলা ছাড়লে কেন? আমার খুব খারাপ লাগছে। ও-লোকটা তবলার কী জানে?'

বিঠলভাই একটুখানি চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল' 'বিভাস-ভাই ও লোকটা অনেক কিছু জানে। আজ থেকে ওর সাহস বেড়ে গেল অনেক—'

একটু আশ্চর্য হল বিভাস। কথাগুলো ভাল বুঝল না। কিন্তু এইটুকু কথা বিঠলভাই যত শান্তভাবেই বলুক, সে বুঝল, এর ভিতর গভীর অর্থ আছে। এই লোকটা একধারে গুণ্ডা এবং তবলচি, হিংস্রতাও কোমলতার অদ্ভুত সংমিশ্রণে এর চরিত্র গঠিত। বিভাস ভাবল এই অপমানের শোধ বিঠলভাই নেবেই। অন্তত তুঙ্গভদ্রার সঙ্গে সে আর তবলা বাজাবে না। আবছা চাঁদের আলোয় বিঠলভাইয়ের মুখে যে করুণ বিষণ্ণতা নেমেছিল তাই দেখে অন্য কিছু ধারণা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু দুনিয়ায় কত আশ্চর্য ঘটনাই ঘটে! পরদিন সকালবেলা সেতার নিয়ে হামিদ হোসেন খাঁর কাছে বাজনা শিখতে যাবার সময় ঘর থেকে বেরিয়েই শুনল ওদিকের বারাণ্ডা থেকে জোর তবলার

আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, সেই সঙ্গে ঘুঙুরের দ্রুতলয়ের ছন্দ। ব্যাপার কী। এত সকালে বিঠলভাইয়ের কাছে কে এল? বিভাস উঁকি মেরে দেখল বিঠলভাইয়ের ঘরে অন্য কেউ নয়, তুঙ্গভদ্রা। নাচের দ্রুতলয় বাজছে তার পায়ে আর বিঠলভাই কোলের কাছে তবলা টেনে নিয়ে মাতালের মতো বাজাচ্ছে। দুজনের কারোরই বাহ্যজ্ঞান নেই। বিভাসের মনে হল বিঠলভাই যেন তবলা বাজাচ্ছে না, নিজেকে পিটছে। একটা ভুজঙ্গিনীর নাচে বিঠলভাই যেন নিজেকে পিটে পিটে ঠিক রাখছে। গুণ্ডা-বিঠলভাই একটা আশ্চর্য যাদুমন্ত্রে তবলচি-বিঠলভাই হয়ে উঠছে।

সে খুশিমনে চলল হামিদ হোসেনের কাছে সেতার শিখতে।

বিঠলভাইকে যেমন সে একটু একটু করে বুঝতে পারছিল, হামিদ হোসেন খাঁও তেমনি একটু একটু করে ধরা পড়ছিল তার কাছে। বুড়ো হয়ে গেছে হামিদ হোসেন খাঁ। অনেক বয়স। শিশুর মতো সরল খোলামেলা একটা মন আছে তার। কিন্তু এই শিশুমনের অন্তরালে কোথাও একটা জটিল আবর্ত পাক খায়—সেটা খালি চোখে দেখা যায় না। বৃদ্ধ হামিদ হোসেন খাঁকে মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যেতে দেখেছে বিভাস। মুখখানা করুণ হয়ে যেতে দেখেছে। তখনই মনে হয়েছে হামিদ হোসেন খাঁর অতীত বলে একটা কিছু আছে। রাগ রাগিনীর রূপ নিয়ে বিভাস আলোচনা, করছিল হামিদ হোসেন খাঁর সঙ্গে, ঝি দামিনী একখানা চিঠি দিয়ে গেল। হামিদ হোসেন মন দিয়ে পড়ল চিঠিখানা তারপর বলল, 'বেটা, মুদ্রাবেটিকে ডাকো তো—' বিভাস ডেকে নিয়ে এল লোপামুদ্রাকে। ওস্তাদজী চিঠিখানা বাড়িয়ে দিল তার হাতে, বলল, 'আফজল তোমাকে কাশী যেতে লিখেছে, অনেকদিন যাওনি—'

লোপামুদ্রা বলল, 'আমারও মনটা যাব-যাব করছে। তুমিও আমার সঙ্গে চলো ওস্তাদজী।—'

হামিদ হোসেন বলল, 'না বেটি, তুমি একাই যাও। আমার শরীরটা ভাল নয়—'

সেইদিন বিকেলে একা-একা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বিভাস।

শীত পার হয়ে বসন্ত এসেছে। বাগানে অজস্র ফুল ফুটেছে। বিভাস ঘুরে ঘুরে ফুলগুলো দেখছিল আর গুণ গুণ করে কী-একটা সুর ভাঁজছিল। হামিদ হোসেন খাঁ নেমে এল। সাধারণতঃ নিচে নামে না হামিদ হোসেন খাঁ, শরীরটা তার সত্যি ভাল যাচ্ছে না, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে তার কষ্ট হয়। কিন্তু আজ চারিদিকে ফুলে ফুলে আনন্দ উৎসব, বাতাসেও একটা প্রসন্নতার আমেজ। এদিকে শরীরের কথা ভুলে যায় মানুষ। বাগানে নেমে এসেও হামিদ হোসেন কিছুক্ষণ নীরবে বেড়াল, ফুল না ছিঁড়ে তার গন্ধ নিল। বিভাস লক্ষ্য করল ওস্তাদজীর মেজাজ বেশ শরীফ রয়েছে। সে বলল এক সময়, 'ওস্তাদজী, রাগ বসন্ত সম্বন্ধে কিছু বলো—না, শুনি।'

হামিদ হোসেন খাঁর মেজাজ সত্যি বেশ শরীফ ছিল কিন্তু সে তখন বিচরণ করছিল দূর অতীতে। নিজে নিজেই বলল, 'বেটা, গান সম্বন্ধে আমি কি জানি। জানে আমার গুরু ভাই ওই ওস্তাদ আফজল খাঁ। গুরুর কৃপা সে পেয়েছে। তোমাকেও একদিন আমি তার কাছে পাঠাব—'

বিভাস বলল, 'তুমি গুরুজীর কৃপা পাওনি?'

হামিদ হোসেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, ,কই আর পেলুম।,

'কেন পেলে না ওস্তাদজী?'

'পাপ। একটা পাপ করেছিলুম, বেটা।'

'পাপ?' বিভাস চমকে গেল।

'হাঁ বেটা, পাপ। ভালবাসার পাপ।' হামিদ হোসেন খাঁ কাঠের বেঞ্চের উপর বসে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল, নতমুখ। তারপর বলল, 'কামনা আর সাধনা একসঙ্গে চলে না—গুরুজী বলতেন। আফজল সর্বমোহমুক্ত ছিল। সে গুরুজীর কৃপা পেল আর আমি তীব্র জ্বালায় দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে না পেলুম সঙ্গীত না পেলুম সংসার। তবে, মনে হয়েছে গুরুজীর কথা মিথ্যে না। সাধনা সম্পূর্ণ না করে কামনার দিকে ঝুঁকতে নেই। বেটা, তুমিও যেন আমার মতো কখনো ভুল কোরো না—'

বিভাস বলল, 'আমি সাধনা করতে চাই ওস্তাদজী।'

হামিদ হোঁসেন প্রসন্ন চোখে শিষ্যের দিকে চেয়ে বলল, 'হাঁ বেটা, সাধনা করে যাও। স্বর হল ঈশ্বর। তাকে পেলেই সব পাবে। আমার আজ কিছু নেই কেউ নেই, আছে শুধু সঙ্গীত, আমি তারই সাধনা করছি। তোমার মধ্যে যথার্থ সঙ্গীত প্রতিভা আছে, আমি দেখেছি, আমি যতখানি পারব তোমাকে শেখাব তারপর আফজলের কাছে পাঠাব। কিন্তু খবরদার ভুলপথে যেও না, কিছুই পাবে না তাহলে—'

বিভাস বলল, 'না ওস্তাদজী আমি ভুলপথে যাব না। তোমাকে কথা দিলাম।' তারপর পাশে বসে বলে, 'মাঝে মাঝে তোমার কথা জানতে ইচ্ছে করে। আমি ভেবে পাইনা তুমি মুদ্রাদিদির কাছে এসে উঠলে কি করে?'

'সবই খোদাতালার ইচ্ছা বেটা।' হামিদ হোসেনের চোখে নেমে আসে অতীতের স্বপ্ন। বলতে থাকে, 'সব মনে নেই। তবে মুদ্রা-বেটির সঙ্গে কি করে সাক্ষাৎ হল তা কোনদিন ভুলব না। সে এক মজার কাহিনী। তুঙ্গভদ্রাকে পেলুম কি করে শোন। আমার গুরুদেব সুন্দর স্বামীর কাছে কুড়ি বছর সঙ্গীত সাধনা করেও তার কৃপা পেলুম না শুধু ওই এক অপরাধে। আমার মনে একটা ধিক্কার জন্মে গেল। আমি সব-কিছু ভোলবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম পথে। অনেক দেশ ঘুরলুম। বুকের মধ্যে ক্ষত-র আগুন তখন একটু একটু করে নিবে এসেছে। মনের মধ্যে সঙ্গীত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ফিরে গেলুম গুরুজীর কাছে কিন্তু তখন তাঁর দেহান্তর ঘটেছে। আফজল গুরুজীকে কাশীতে দাহ করে রয়ে গেছে সেইখানেই—

আমি আবার বেরুলুম পথে। ভাবলুম সব দেশ তো ঘুরলুম এবার যাব বাংলায়, বাংলার সেরা শহর কোলকাতায়। চড়ে বসলুম কোল-কাতার গাড়ীতে। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে হাওড়ায় এসে যখন চোখ খুললাম তখন দেখি সকাল হয়ে গেছে, নেমে যাচ্ছে লোক একে-একে। শুয়ে-ছিলুম বাংকে, ধীরে সুস্থে সেখান থেকে নেমে দেখি কামরার এককোণে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে একটি কিশোরী মেয়ে। তাকে জাগালুম।

রুক্ষ চুল, মলিন বেশবাস। বললুম, 'খোকি, হাওড়া তো এসে গেছে, নেমে এসো—'

খোকি ঘুম-ভাঙা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল। কী করি। খুব বিব্রত বোধ করছিলাম। আমি কামরা থেকে নামলুম সে-ও নামল, আমি ষ্টেশানের বাইরে এলুম তো সে-ও এল। একবার ভাবলুম পুলিশের হাতে তুলে দিই, কাদের ঘরের মেয়ে কে জানে, কেন মিছামিছি ঝকি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু খোদাতালার ইচ্ছে বোধ হয় তেমন ছিল না। বাইরে বেরিয়ে এসে মেয়েটি এমন করে আমাকে জড়িয়ে ধরল যে তার নরম কচি হাতের বাঁধনে পড়ে আমার মনের ভিতরটা করুণায় হু-হু করে উঠল। কথা বার্তায় বুঝেছিলুম সে এক ভিখিরির মেয়ে, ভিক্ষে করতে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিল ট্রেণে। কেউ নেই তার, আমি যেন তাকে ছেড়ে না দিই—।

ভাবলুম এ কী আপদ। তারপর নিলুম সঙ্গে।

কোলকাতায় এসেছিলুম আমি সেরেফ একটি সারেংগী সম্বল করে, জুটল ওই তুঙ্গভদ্রা। ভেবেছিলুম এত বড় শহর কোলকাতা কোথাও একটা আশ্রয় জুটে যাবেই। কিন্তু দেখলুম পাথর কোলকাতা কাউ-কেই রেয়াৎ করে না—এখানে জায়গা পেতে হলে লড়াই করতে হয়। ঠিক তোমার মতো অবস্থা আর-কি। দুটো রাত্রি কোন রকমে কাটল, তৃতীয়দিনে দেখি তুঙ্গভদ্রা বিলকুল নেতিয়ে পড়েছে—চিঁচিঁ করছে খিদেতে। সহ্য করতে না পেরে এক সময় আমাকে জানাল, সে নাচবে আর আমি যদি তার সঙ্গে সারেংগী বাজাই তাহলে এখুনি কিছু পয়সা জুটে যাবে। শুনে আমি ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিলুম ওর গালে। ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁ গান গেয়ে ভিক্ষে করবে কোলকাতা শহরে? ভদ্রা বেটির চোখে জল এসে গেল, আমি ওকে বুকে টেনে নিলুম। ভাবলুম এতটুকু মেয়ের খিদে মেটাতে পারি না এ আমি কেমন পুরুষ? আমার বুকের ভিতর জ্বলতে লাগল।

ক্রমে সকাল গেল, বিকেল গেল, সন্ধ্যে হল। আমরা হাঁটা সুরু

করে দিয়েছিলুম, ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছুলুম উত্তর কোলকাতার এক সিনেমা হাউসের সামনে। দেখলাম বেজায় ভিড়। মোটর আসছে আর থামছে। সম্ভ্রান্ত ঘরের লোকেরা নামছে। কয়েকজন শিল্পীকেও দেখলুম সেতার সরোদ নিয়ে ভিতরে ঢুকছে। চারদিকে ভিড় থই-থই করছে। ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেরি হল না—নিশ্চয় কোন গানের আসর। মন খুশিতে ভরে উঠল। এই রকম সুযোগই আমি খুঁজছিলাম। সুতরাং পা পা করে সোজা এক কর্তাব্যক্তির কাছে গিয়ে নিবেদন করলুম, 'আমি লাহোরের ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁ, আমাকে এই আসরে একটা গান গাইতে দেবেন?' যেন এক তাজ্জব কথা শুনছে এইভাবে লোকটি আমার মুখের দিকে তাকাল, তারপর তাকাল আমার সাজপোশাকের দিকে। তিনদিনের অনাহারে আমার শরীর শীর্ণ, সাজপোশাক ময়লা। লোকটি একটুও দ্বিধা করল না, সোজা বলল, 'যাও ওই ফুটপাতে বসে গাও গে দুটো পয়সা পাবে।' রাগে, উত্তেজনায় ফের আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কিন্তু এ তো তুঙ্গভদ্রা নয়, অনেক কষ্টে রাগ সামলিয়ে কাঁপতে কাঁপতে নেমে এলুম ফুটপাতে। হন হন করে চলে গেলুম কিছুদূর তারপর আবার ফিরে এলুম সিনেমা হাউসের সামনে। বসে পড়লুম ফুটপাতের ওপর। ভদ্রা অবাক। আমার নিজের কোন জ্ঞানগম্যি ছিল না। শুধু মাথার ভিতর জ্বলছিল এ অপমানের শোধ আমাকে দিতেই হবে।

ভাবতে পারো লাহোরের ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁ কোলকাতায় এসে স্বীকৃতি পেয়েছিল ওই ফুটপাতে বসে গান গেয়ে? অনেক সমঝদার লোক তখনো আসছিল, ভিড় লেগেছিল চারপাশে। এক পাশে বসে আমি সারেংগী ছেড়ে ধরে দিলুম গান। আস্তে আস্তে আমার চারদিকে ভিড় বাড়ছিল। লক্ষ্য করলুম শিল্পীদের অনেকেই ভিড় করে দাঁড়িয়েছে আমার খুব কাছাকাছি। একটি মোটর এসে দাঁড়াল। তার ভিতর থেকে নামল একটি তরুণী। ভিড়ের মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উঠল, কিন্তু জনতা পথ ছেড়ে দিল মেয়েটিকে। সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগল। এই-ই লোপামুদ্রা। কোলকাতায়

নাচে আর গানে তখন তার খুব নামডাক। আমার গান শেষ হয়ে গেলে সে আমার হাত ধরে তুলল, বলল, 'চলো ওস্তাদ, তোমার গান আমরা আসরে বসে শুনব—'

সারারাত্রি সেই আসরে ছিলাম। গান গেয়েছি। লোপামুদ্রাও গেয়েছে। এ সব পনেরো বছর আগেকার কথা। লোপামুদ্রা তারপর আমাকে নিয়ে আসে তার এই বাড়িতে। তুঙ্গভদ্রাকে শেখায় নাচ। সেই থেকে আমি আর তুঙ্গভদ্রা রয়ে গেছি তার কাছে—'

অন্ধকার নেমে আসছিল বাগানে। বিঠলভাইয়ের তবলা শোনা যাচ্ছিল আসরের ঘর থেকে। ওরা বাড়ির ভিতরে চলল।

সরযূপ্রসাদ লোকটি অতিশয় ধূর্ত। সে শনৈ শনৈ তুঙ্গভদ্রার দিকে এগোচ্ছিল। তুঙ্গভদ্রার দুর্বলতা কোথায় তা সে বেশ ভাল করেই জানে। ভিখিরির মেয়ে নাচ আর গান শিখে ধাপে ধাপে আজ এত উঁচুতে উঠে এলেও ওর মনের মধ্যে কোথাও একটি নীড় বাঁধবার বাসনা রয়ে গেছে, এটা সে একটু একটু করে টের পেয়েছিল। আজকাল আসর একা তুঙ্গভদ্রাই মাত করে রাখে। পায়রার মতো উঁচু বুক ঠেলে ঠেলে রক্তে আগুন লাগা নাচ সে নাচে, আবার তার সঙ্গে চটুল ভঙ্গিতে ধরে মনে আগুন জ্বালানো ঠুংরী। তুঙ্গভদ্রা ঠিক যেন একটি জীবন্ত কামনা হয়ে লোকজনকে পাগল করে তোলে। ওর রক্তে আছে বুনো কামনা। মানুষকে সে যেমন তাতায়, নিজেও সেই সঙ্গে তেতে ওঠে। পুলকবাবুর চোবসানো গাল আরো ঝুলে পড়ে, চোখের ভিতর ঠিকরে পড়ে আগুন। তার সঙ্গী ধনী কুনোয়ার সিং দরাজ হাতে টাকা ঢালে, মদ আসে, বোতলের পর বোতল শেষ হয়। সারা আসর হয়ে উঠে এক ভয়ংকর নরককুণ্ড। সহজে ক্লান্ত হয় না তুঙ্গভদ্রা, তবুও তাকে থামতে হয় একসময়। বিঠলভাই তবলা সরিয়ে রাখে একপাশে, সরযূপ্রসাদ বেটাল তুঙ্গভদ্রার দিকে আড়ে আড়ে চেয়ে সারেংগী টাঙিয়ে

রাখে দেয়ালে, হামিদ হোসেন চলে যায় নিজের ঘরে। পুলকবাবু কিন্তু চলে যায় না, কুনোয়ার সিংও যায় না, নোটের তাড়া এগিয়ে দেয়, আরো মদ আসে। বুঝতে পারে সরযূপ্রসাদ, তুঙ্গভদ্রা এখন টাকার খপ্পরে, যার সঙ্গে পাল্লা লড়া তার সাধ্যাতীত। সে সকলকে 'রামরাম' জানিয়ে বিদায় নেয় কিন্তু অপেক্ষা করতে থাকে তুঙ্গভদ্রার আরো নিকটবর্তী হবার।

লোপামুদ্রা নেই। সে কাশীতে গেছে ওস্তাদ আফজল আলি খাঁর কাছে। কবে ফিরবে বলে যায়নি। বাড়ির আবহাওয়া একেবারে বদলে গেছে। বিঠলভাই চুপচাপ বিষন্নভাবে বসে থেকে বলে, 'ওস্তাদজী এই রকম করে লাগাম ঢিল দেওয়া ঠিক নয়, তুমি একটু ভদ্রাকে ধমকে দাও—'

হামিদ হোসেন উত্তর দেয়, 'আমি ধমক দিলেও কোন কাজ হবে না বিঠলভাই, ওর যথেষ্ঠ বয়স হয়েছে, নিজের ভালমন্দ নিজেই বোঝে। বরং তাতে আরো খারাপ ফল হতে পারে—'

কথাগুলো একেবারে মিথ্যে নয়। বিঠলভাই দুচারবার তাকে সাবধান হতে বলেছিল কিন্তু প্রত্যুত্তরে তুঙ্গভদ্রা তাকে 'মোটা হাতি' বলে এমন কতকগুলো নির্মম ব্যঙ্গ করেছিল যে, তারপর আর কোন কথা বলা চলে না। তুঙ্গভদ্রা নিজের স্রোতেই ভেসে চলেছিল।

বিভাসের ভাল লাগত না এই আসর। তাছাড়া তার নিজের রেওয়াজ আর পড়াশোনার চাপ ছিল। ইতিমধ্যে সে আই, এ পাশ করে বি, এ পড়ছে। আসরের যে সময়ে হৈ হল্লা চলে সেই সময় নিজের ঘরে বসে সে হয় সেতার বাজায় না-হয় তবলা পেটে। নিজস্ব ঘরের নির্জনতায় তার কোন ব্যাঘাত ছিল না। তানপুরা ছেড়ে কখনো গান গাইত, কোনদিন-বা পড়াশোনা করত। নিজের ঘরেই সে একটি নিজের জগৎ রচনা করে ফেলেছিল। কিন্তু লোপামুদ্রা না থাকায় তার এই নির্জনতা বার বার ব্যাহত হতে লাগল। যে লোকটিকে সে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে সেই আ-বুড়ো পুলকবাবু যখন তখন এসে উৎপাত ঘটায়। অশ্লীল ইয়ার্কি দেয়। লোপামুদ্রা সম্বন্ধে যা তা মন্তব্য করে। তারপর অধিক রাত্রে তার

হল্লা শোনা যায় তুঙ্গভদ্রার ঘরে। বেহেড মাতালের আনন্দ উল্লাস ভেসে এসে সারা বাড়ি সচকিত ক'রে। তুঙ্গভদ্রার জড়িত গলার স্বরও শোনা যায়। বিভাস ঘুমুতে পারে না অনেক রাত্রে। তার বিরক্তি লাগে। হামিদ হোসেন নির্বিকার। সে-ও আসরে যায় না বড় একটা।

এরই ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই সরযূপ্রসাদ তার মন গলায়। ধাপে ধাপে এগোয়। অসীম ধৈর্য তার, দারুণ চতুর। পুলকবাবুর মতো এক আধ রাত্রি সে চায় না তুঙ্গভদ্রাকে, তার চাহিদা আরো ব্যাপক আরো সুদূর। তোয়াজ, খোশামোদ, মহব্বৎ—যখন যেটি সুবিধা মনে করে তখন সেটি ব্যবহার করে। কথা বলার ধরন-ধারনেও সে অসীম দক্ষ। সুযোগ পেলেই সে বোঝায় এখানে শুধু যৌবনের দাম, যৌবন ফুরিয়ে গেলেই সব কদর বরবাদ হয়ে যাবে। তখন দেখবার কেউ থাকবে না সান্ত্বনা দেবার কেউ থাকবে না। অথচ সময় থাকতেই যদি সে ঘর বাঁধে তাহলে শুধু এই যৌবনেই নয়, সারা জীবনের মতো শান্তি। সরযূপ্রসাদ তার জন্যে জান্ দিয়ে খাটবে, তাকে 'দিল্-কা-রাণী' করে রাখবে। নানাভাবে বোঝায় সরযূপ্রসাদ, নানা রকম স্বপ্ন দেখায়। তুঙ্গভদ্রা কানেই তুলতে চায় না ওর কথা : কিন্তু ও চলে গেলে কিছুক্ষণ ধরে ওর কথাগুলো কানের ভিতরে বাজে। তারপর ঝেড়ে ফেলে দেয়। আবার মেতে যায় আসরের নাচে আর গানে। ওর মন স্থির নয়।

সরযূপ্রসাদ ব্যাপারটি বোঝে তাই তাড়াহুড়ো করে না। কিন্তু উপরি লাভটুকু সে ছাড়বে কেন। সুযোগও এসে যায়। অনেক রাত্রে আসর ভাঙার পর দেখা গেল বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। সরযূপ্রসাদ বলল, 'ইস্—এই বৃষ্টিতে আমি বাড়ি যাই কি করে ?'

তুঙ্গভদ্রা বলল, 'বাড়ি যাবে কেন এইখানেই থেকে যাও।'

'থেকে যাব ?'

'হাঁ থেকে যাও। বিঠলভাইয়ের ঘরে অনেক জায়গা আছে।'

বিঠলভাইকেই ভয় করে সরযূপ্রসাদ। কিন্তু তুঙ্গভদ্রার ঠোঁটের টেপা-হাসিটি লক্ষ্য করেছে সে। হয়তো রঙ্গময়ীর এ এক রঙ্গ।

বিঠল ভাইয়ের ঘরে শুতে বলে তার ঘরে যেতে বলা। গোরিলার কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে তবে মিলবে পুষ্পের আলিংগন। মুখ টিপে হেসে চলে গেল তুঙ্গভদ্রা। বিঠলভাই না-হাঁ কিছুই বলল না। বাইরে সত্যি প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। সে সরযূপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল।

ঘর বটে একখানা বিঠলভাইয়ের! বড় ঘর নিঃসন্দেহে কিন্তু কাঁসা ডুগিতবলায়, প্রকাণ্ড একখানা চৌকিতে আর ব্যায়াম করার ডাম্বেল-মুগুরে সে-ঘর ভরতি। চাপা ও ভ্যাপসা। ঘরের একোণ থেকে ওকোণে টাঙানো দড়িতে কাপড়জামা, দেয়ালের কোণে এখানে ওখানে কুঁজো, থালা বাসন। একটি ক্যাম্পখাট ছিল। জিনিস পত্র গুলো সরিয়ে খানিক জায়গা করে সে পেতে দিল ক্যাম্পখাটখানা। বলল, 'নাও, শুয়ে পড়ো সরযূপ্রসাদ।'

ক্লান্তি ছিল দুজনেরই বেশি কথা হল না। শুয়ে পড়ল উভয়ে। ক্যাম্পখাটখানা বার কতক মচমচ করে উঠল সরযূপ্রসাদের দেহের চাপে, তারপর নিঃসাড়। বিঠলভাই চৌকিতে শুয়ে এপাশ ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়ল ভোঁস ভোঁস করে।

রাত্রি গভীর। বাইরে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। আর সব শান্ত, নিঝুম। ক্যাম্পখাটে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে সরযূপ্রসাদ সাবধানে উঠে বসল। আবার শব্দ হল—ক্যাচ ক্যাচ। অন্ধকারে দৃষ্টি প্রখর করে সে তাকাল বিঠল ভাইয়ের ঘুমন্ত বিরাট চেহারাখানার দিকে। না, ঘুমচ্ছে বিঠলভাই। এই তো সময়! সরযূপ্রসাদ খাট থেকে নেমে আস্তে আস্তে দরজার খিল খুলল।

বিঠলভাই কিন্তু ঘুমোয়নি, ঘুমের ভাণ করে পড়েছিল। ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছিল সে। সরযূপ্রসাদকে খিল খুলে বাইরে যেতে দেখে সে-ও আস্তে আস্তে উঠে তাকে অনুসরণ করল।

ওদিক থেকে বারাণ্ডাটা এসে বিঠল ভাইয়ের ঘর ছুঁয়ে বাঁক নিয়েছে তুঙ্গভদ্রার ঘরের কাছে গিয়ে। বাঁকের মুখেই তুঙ্গভদ্রার ঘর। অন্ধকার বারাণ্ডার দেয়ালের সতে মিলে সরযূপ্রসাদকে অনুসরণ করছিল

বিঠলভাই। কিছুদূর যেতেই সে দেখতে পেল সরযূপ্রসাদ টোকা-মারছে তুঙ্গভদ্রার ঘরের দরজায়। আরো দেখল চুপিচুপি দরজা খুলে দিল তুঙ্গভদ্রা, আর শুনল ফিসফিস করে তুঙ্গভদ্রা বলছে : 'মোটা-হাতি টের পায়নি তো ?' সরযূপ্রসাদ বলল, 'জানোয়ারটা ভোঁইসের মতো ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে।' দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ফিরে এল বিঠলভাই।

সরযূপ্রসাদ ফিরে এল তারো খানিক পরে। তেমনি সন্তর্পনে দরজায় খিল লাগালো সে, শুয়ে পড়ল ক্যাম্পখাটে। বারকতক ক্যাচ ক্যাচ করে উঠল ক্যাম্পখাট তারপর একেবারে নিঃসাড়। পরম তৃপ্তিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল সরযূপ্রসাদ। কিন্তু ঘুম এল না বিঠলভাইয়ের চোখে। সে চোখ মেলে সবই দেখল। তার রক্তের মধ্যে তখন প্রচণ্ড বেগে যেন বেজে চলেছে ত্রিতালের লহরা, বুকের ভিতর তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে রক্তের সমুদ্র। কিন্তু কী তার জ্বালা কী তার যন্ত্রণা কিছুই সে টের পাচ্ছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল একটা পাকা শয়তান তার মানসীকে ছোবল বসিয়ে চলে এল এবং সে তা নিজের চোখেই দেখল। চোখের ভিতর থেকে একটা ভয়ংকর জ্বালা ফুটে বেরুচ্ছিল বিঠলভাইয়ের, উত্তেজনায় বড় বড় শ্বাস ফেলছিল। তার রক্তের মধ্যে এল গেল সেই গুণ্ডা,—যে কোনপ্রকার বাচ-বিচার না করে নির্মম হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফ্যালে প্রতিদ্বন্দ্বীকে। দাঁত গুলো কিড়মিড় করে উঠল বিঠলভাইয়ের, হাতের পেশী শক্ত হয়ে গেল। শয়তানটা নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে তারই পেতে দেওয়া ক্যাম্পখাটটায়—কী তৃপ্তির ঘুম, কী আরামের সুখনিদ্রা! বিঠলভাই উঠে গিয়ে দাঁড়াল সরযূপ্রসাদের শিয়রে। অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু প্রজাপতি উড়ু উড়ু গোঁফে যেন লেগে রয়েছে একজনের চুমার স্বাদ : রোগা পাতলা বুক, সেখানে যেন লেগে রয়েছে পায়রা উঁচু একটি বুকের ঘনিষ্ঠ আশ্লেষ। ঘুমুচ্ছে লোকটা। ঘুমুচ্ছে পরম শান্তিতে। বিঠলভাইয়ের দাঁতগুলো ফের কিড়মিড় করে উঠল, হাতের মুঠো শক্ত করে এগিয়ে গেল সরযূপ্রসাদের গলা লক্ষ্য করে। কিন্তু কী একটা তীব্র যন্ত্রণায় পরক্ষণে

ফিরে এল প্রতিহত হয়ে। বিঠলভাই ঠিক যেন ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মতো পায়চারি করতে লাগল ঘরময়— হাত দুটো পিছন দিকে মোড়া। সেই গুণ্ডাটা মরে গেল নাকি? হাতের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে তার মুঠো ফিরে আসছে কেন বার বার? বিঠলভাই মাথার চুল ধরে প্রবল বেগে ঝাঁকাতে লাগল। একবার করে সরযূপ্রসাদের কাছে আসে, ঝুঁকে পড়ে তার নিদ্রিত মুখখানা ছাখে, আবার ছিটকে গিয়ে ঘরময় পায়চারি করে। ভালবাসে। ভালবাসে তুঙ্গভদ্রা এই ভয়ংকর লম্পটটাকে। এর ঠোঁটে, বুকে, সারা শরীরে, লেগে রয়েছে তুঙ্গভদ্রার ভালবাসার স্বাক্ষর। তুঙ্গভদ্রার ভালবাসার লোকের গায়ে হাতে তুলতে কিছুতেই মন চাইছে না তার। গেরিলার আক্রোশ নিয়ে গুণ্ডা বেরিয়ে আসছে তার বুকের গুহা থেকে, ভীষণভাবে সে হুংকার ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছে শিকারের প্রতি, পর মুহূর্তে গুলি-খাওয়া তীব্র যন্ত্রণায় ফিরে ফিরে আসছে। কিছুতেই থাবা বাড়াতে পারল না বিঠলভাই। পরিবর্তে দেয়ালে গিয়ে সে প্রচণ্ড বেগে মাথা খুঁড়ল। অবশ বিবশ হয়ে ক্রমাগত ক্ষত বিক্ষত করতে লাগল নিজেকে।

সকাল বেলা সরযূপ্রসাদ ঘুম থেকে উঠে দেখল বিঠলভাই তখনো দেয়ালে মাথা গুঁজে পড়ে রয়েছে। চোখ দুটো মাতালের মতো লাল, চুল উস্কখুস্ক। সারা শরীরে গভীর শ্রান্তি। যেন একটা জানোয়ার পিছু হটতে-হটতে দেয়ালের কাছে এসে দেয়ালের সঙ্গেই লড়াই করে করে ক্লান্ত। সরযূপ্রসাদ আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'আঃ কাল রাত্তিরে যা ঘুম হল, অনেক দিন এ-রকম ভাল ঘুম হয়নি—' তারপর বিঠলভাইয়ের দিকে নজর পড়তেই বিস্মিত হয়ে বলল, 'আরে, অমন করে ঘাড় গুঁজে পড়ে রয়েছো কেন? শরীর খারাপ নাকি?'

কোন কথা বলল না বিঠলভাই, শুধু একবার জ্বালা ধরা চোখে ওর দিকে চাইল। সরযূপ্রসাদের বুকের ভিতর গুরগুর করে উঠল, আর কোন কথা বলতে সাহস পেল না। 'আচ্ছা চলি—'বলে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বিঠলভাই তেমনি পড়ে রইল দেয়ালের কোণে ঘাড় গুঁজে।

আস্তে আস্তে বেলা বাড়ে। এক এক করে ঘুম ভাঙে এ-বাড়ির। বিভাস উঠে হামিদ হোসেনের ঘরে চলে যায় সেতার নিয়ে। বেরিয়ে আসে দামিনী, বাড়ির ঝি। লেগে যায় গৃহকর্মে। ওঠে চাকর গঙ্গাধর, বাজারের ফর্দ নিয়ে চলে যায় বাজার করতে। বুড়ো অদ্বৈত মালী টুকটুক করে নিচে নামে, জলের ঝাঁঝরিতে জল ভরে লেগে যায় বাগানের পরিচর্যায়। ড্রাইভার সুরজিৎ সিংকে দেখা যায় লাঠির মতো মোটা একটা নিমের দাঁতন নিয়ে দাঁত পরিষ্কার করছে নিচের গাড়ি-বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আর সুযোগ মতো ফষ্টিনষ্টি করছে দামিনীর সঙ্গে। ওঠে তুঙ্গভদ্রা। রাত্রির আলস্য গা থেকে ঝেড়ে ফেলে গুণ গুণ গানের সঙ্গে পায়ে বাঁধে ঘুঙুর। ঘাঘরা কোমরে জড়িয়ে নেয় রাত্রিবাস ছেড়ে। বুকে টান করে বাঁধে কাঁচুলি, তার উপরে ফেলে দেয় পাতলা ওড়না। ঝুমঝুম ঘুঙুরের আওয়াজ তুলে পায়রার মতো বুক ঠেলে-ঠেলে সে এসে ঢোকে বিঠলভাইয়ের ঘরে। বিঠলভাই তখনো মেঝেতে বসে।

তুঙ্গভদ্রা বলে, 'আ জী ব্যস! এখনো বসে রয়েছো তুমি? নাও, নাও তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে নাও, আমি বেশি দেরি করতে পারব না—'

কেমন এক ঘোর-ঘোর আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় বিঠলভাই। ফের তাড়া দেয় তুঙ্গভদ্রা, সে যন্ত্র চালিতের মতো উঠে ধুয়ে আসে মুখ-হাত। তুঙ্গভদ্রা পা ফেলে ফেলে এক দুই তিন করছিল। বিঠলভাই ফিরে এসে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো ডুগি তবলার সামনে বসল। তবলা টেনে নিল কোলের কাছে, তারপর সুরু করল বাজাতে।

হামিদ হোসেন খাঁর কাছ থেকে সেতার শিখে বিভাস ফিরছিল আরো বেলা হয়ে গেলে। নাচ তখন জমে উঠেছে। বিভাস দরজার কাছ থেকে উঁকি মেরে দেখল, দ্রুতলয়ে উদ্দামবেগে নাচছে তুঙ্গভদ্রা আর তার সঙ্গে তুমুলভাবে তবলা বাজাচ্ছে বিঠলভাই। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে বিভাসের মনে হল বিঠলভাই যেন তবলা বাজাচ্ছে না, নিজেকে পিটছে, পিটে পিটে ঠিক রাখছে নিজেকে।

লোপামুদ্রা ফিরে আসার পরও ওই পুলকবাবুর কাণ্ডকারখানা দেখে বিভাস অবাক। প্রায়ই এ-মহলে চলে আসে পুলকবাবু। বারণ করলে শোনেনা, ধমকালে চোখ লাল করে। সন্ধ্যার পর ও-মহলে পুরোদমে চলে তুঙ্গভদ্রার নাচ আর এ-মহলে বিভাস নিজের মনে করে সাধনা। লোপামুদ্রা খানিকক্ষণ ও-মহলে থেকে চলে আসে বিভাসের কাছে। ওকে শেখায় গান। আলাপ আলোচনা করে রাগ-রাগিনী নিয়ে। কিন্তু বেশিক্ষণ চলে না আলাপ আলোচনা। প্রায়ই পুলক-বাবু উঠে আসে টলতে টলতে। লোকটা বুড়ো হয়ে গেছে। চোবসানো গাল, বসা চোখ। চোখে মুখে একটা ক্রুর ধূর্ততা। টলতে টলতে বিভাসের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। বসা-চোখের ভিতর থেকে এক লুব্ধ আলো ছড়িয়ে ঠায় তাকিয়ে থাকে লোপামুদ্রার দিকে। কিছুক্ষন গান শোনে তারপর কোন জানান না দিয়েই ঘরের ভিতর ঢোকে, মুখে জড়িত কণ্ঠের প্রশংসাঃ 'বাঃ, খাসা, মুদ্রাবাঈয়ের গলাটা এখোনো ঠিক আগের মতোই আছে দেখছি!'

লোপামুদ্রা খুব বিরক্ত হয়। ওর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলে, 'এদিকে কে আসতে বললে তোমায়? যাও বলছি এখান থেকে—'

'যাব, যাব—' পুলকবাবু হেঃ হেঃ করে খানিকক্ষন হাসে, বলে, 'তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল—'

লোপামুদ্রা বলে, 'কী দরকার?'

'ইয়ে—' পুলকবাবু টলতে টলতে কাছে চলে আসে, লোপোমুদ্রার সামনে হাত পেতে বলে, 'মাইরি, শ-খানেক টাকা দরকার। নইলে বড্ড বেইজ্জতি হব—'

টলে পুলকবাবু, আর লুব্ধ চোখে লোপামুদ্রার দিকে তাকায়ঃ 'তুমি থাকতে এই সামান্য কটা টাকা পাব না, এ কি হতে পারে? কতদিকে তো খরচ করছো, এ-হতভাগা তার একটু প্রসাদ—'

গুম হয়ে বসে থাকে লোপামুদ্রা। বলে, 'টাকা দিলেই চলে যাবে—?'

পুলকবাবু জোরের সঙ্গে মেঝেতে পা ঠোকেঃ 'আলবৎ—'

লোপামুদ্রা টাকা এনে দেয়, পুলকবাবু চলে যায়। ওই টাকাটা মদে আর মেয়েমানুষের খরচ হবে—হয়তো ওই তুঙ্গভদ্রার পিছনেই, লোপামুদ্রা এ কথা যেমন জানে বিভাসও জানে তেমনি। জেনে শুনে লোপামুদ্রা টাকা এনে দিল, ব্যাপারটাতে খুব বিস্ময় বোধ করে বিভাস। এমনভাবে টাকা কাউকে দেয় না লোপামুদ্রা। বিভাস বলে' 'ওকে টাকা দিলে কেন দিদি? ও তো এক্ষুনি মদে আর মেয়েমানুষে খরচ করে ফেলবে—'

লোপামুদ্রা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে তানপুরাটা তুলে নেয়, বলে, 'নাও ধরো দিকিনি—' আবার গানের মধ্যে ডুবে যায় সে। ওর মুখের উপর থেকে বিরক্তির চিহ্ন দূর হয়ে যায়, গানের মধ্যে সে আবার পুরো মেজাজ এনে ফেলে। বিভাস বরাবরই লক্ষ্য করছে মুদ্রাদিদির জীবন যতই এলোমেলো হয়ে থাক গানের মধ্যে এলে সে যেন পরম তৃপ্তি লাভ করে। একটা শিল্পী মেজাজ আছে মুদ্রাদিদির। তা না হলে পথের মাঝখান থেকে অপরিচিত অবজ্ঞাত হামিদ হোসেনকে নিজের ঘরে তুলে আনতে পারত না, তাকেও আশ্রয় দিতে পারত না; এমন কি তুঙ্গভদ্রার মতো দেহ সর্বস্ব মেয়েকে বরদাস্ত করতে পারত না। কিন্তু তবুও যেন মনে হয় কোথাও একটা গভীর ক্ষত রয়ে গেছে মুদ্রাদিদির ভাবনাটা বেশিক্ষন রাখতে পারে না বিভাস, ওকেও গাইতে হয়। দুজনকার গলা মিলেমিশে একটা অপূর্ব সঙ্গীত-পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় ঘরের মধ্যে।

আবার আসে পুলকবাবু আবার টাকা চায়। লোপামুদ্রা কোনোবারে দেয় কোনবারে দেয় না। সকালবেলা প্রায়ই দেখা যায় তুঙ্গাভদ্রার ঘর থেকে মাথার চুল ঠিক করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছে পুলকবাবু, নিজের ঘর থেকে তা ছাখে লোপামুদ্রা, তার মুখটা শক্ত হয়ে যায়, পা-পা করে এসে রেলিংয়ের ধারে বহুক্ষন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর ঢোকে বিভাসের ঘরে। শান্তস্বরে বলে, 'নাও, তানপুরাটা পাড়ো, তোমাকে ললিত গেয়ে শোনাই—' ললিত রাগের মর্মার্থ জানে বিভাস। পরিপূর্ণ মিলন-ভোগের গান। সে কোন কথা বলে না, তানপুরাটা

পেড়ে দিয়ে চুপ করে শোনে লোপামুদ্রার গান। বিভাস লক্ষ্য করে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে লোপামুদ্রার ললিত গাইতে গাইতে। থাকতে না পেরে সে জিজ্ঞেস করে, 'ও-লোকটা কে মুদ্রাদিদি?'

'কোন্ লোকটা?'

'ওই পুলকবাবু—'

'কেউ না।' লোপামুদ্রা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে, বলে, 'ও আমার শনি—'

এই ভাবেই বিভাসের দিন কাটছিল। লোপামুদ্রার কাছে সে শিখছিল গান, হামিদ হোসেন খাঁর কাছে সেতার আর বিঠল ভাইয়ের কাছে তবলা। চার বছরে তবলাতেও সে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে, বিঠলভাই খুব আগ্রহ নিয়ে তাকে শিখিয়েছে, বিভাসও তার যোগ্য মর্যাদা রেখেছে রেওয়াজ করে করে। ওর তবলার মহড়া হয়ে গেল একদিন তুঙ্গভদ্রার নাচের সঙ্গে বাজাতে বসে। নাচের ব্যাপারে তুঙ্গভদ্রা কোন প্রকার ক্ষমা করে না তবলচিকে। নতুন কি পুরোনো তবলচি—কোন খেয়াল রাখে না সে। বরং, নিজের আধিপত্য বজায় রাখার জন্যে যত-সব দুরুহ-দুরুহ তান আর তেহাই তোলে, লয়ের মধ্যে নানা রকম ভাঙচুর আনে। কিন্তু বিভাস তাকে সমানে জবাব দিয়ে গেল। বাজনার শেষে তুঙ্গভদ্রা পায়রার মতো বুকঠেলে বিভাসের খুব কাছে এল, বলল, 'বিভাসবাবু, খুব ভাল বাজিয়েছো। কী ইনাম চাই বলো?'

বিভাস বলল, 'ভালো বাজিয়েছি এই কথাটাই আমার ইনাম। যদি কিছু দিতে চাও আমার গুরুজীকে দাও—'

তুঙ্গভদ্রা ছিটকে গেল, 'মোটা হাতি তোমার গুরু, বুদ্ধিটাও পেয়েছো মোটা হাতির মতো!'

বিঠলভাই পাশে বসেছিল, সে কি বলতে গিয়ে দেখল তুঙ্গভদ্রা চলে গেছে ঘর থেকে।

বিভাসকে কিন্তু ছাড়ল না তুঙ্গভদ্রা। সেইরাত্রে বিভাস দরজা বন্ধ করে শুতে যাচ্ছিল, তুঙ্গভদ্রা ঢুকে পড়ল টুক করে। বিস্রস্ত মাথার চুল চোখে নেশার ঘোর। পায়রার মতো উঁচু বুক ঠেলে এলো মেলো পায়ে সে এগিয়ে এল বিভাসের কাছে, বলল, 'জানো, আমার ইনাম কেউ কখনো ফেরৎ দেয়নি? তুমি আমার প্রাণে বড় দাগা দিয়েছো, বিভাসবাবু।'

বিভাস বলল, ভদ্রাবাঈ, তোমার ইনাম পাবার জন্যে অনেক লোকে হাঁ করে বসে আছে—'

'নরকের কীট সব।' তুঙ্গভদ্রা হেঁচকি তুলল, আমি যাকে ভালোবাসি তারজন্যে সব করতে পারি। এই বাড়ী টাকাপয়সা সব আমার কাছে তুচ্ছ। জানো, একদিন আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারি?'

বিভাস নিরীহভাবে বলল, 'কার সঙ্গে যাবে?'

'সে আমি বলব কেন?' তুঙ্গভদ্রা দেওয়ালের কাছে এগিয়ে গেল, 'যাবার আগে আমার ইনাম দিয়ে যাব তোমাকে—'

হাত তুলে নিবিয়ে দিল আলো।...

গান-বাজনা নিয়ে বিভাস যতই মেতে থাকুক পড়াশোনাটাও করে যাচ্ছিল সেই সঙ্গে। ওর বি-এ পরীক্ষার বেশী দেরি ছিল না। শেষের দিকে একটু চেপে খাটল। ভালো তৈরি হতে পারল না তবু নামল পরীক্ষায়। গান বাজনা তাকে যেমন ভাবে গ্রাস করছে দেরি করলে আর পরীক্ষাই দিতে পারবে কিনা সন্দেহ ছিল। শেষদিন পরীক্ষা দিয়ে সে বেরিয়ে আসছিল হল্ থেকে, দেখতে পেল, তার আগে-আগে একটি ছেলে চলেছে কলেজ-প্রাঙ্গন পার হয়ে। কাছাকাছি আর-কেউ নেই। অগ্রবর্তী ছেলেটি এমনভাবে পা ফেলে-ফেলে চলেছে যে মনে হল যেন টলছে। কলেজ গেট পার হয়ে ফুটপাতে নেমেই ছেলেটি পড়ে যাচ্ছিল হুমড়ি খেয়ে, বিভাস তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল। বলল 'কি হয়েছে ভাই? এক্ষুনি যে পড়ে যেতেন—'

'আমাকে একটু পৌঁছে দেবেন?' ছেলেটি তার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ থেকে ক্লান্তস্বরে বলল।

'কোথায় থাকেন?' বিভাস তার কপালে হাত দিয়ে দেখল ভীষণ জ্বর, বলল, 'সত্যি, গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে—'

'সুরেন ব্যানার্জি রোডে—' ছেলেটি প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়ল বিভাসের কাঁধে।

একটা রিক্সা ডাকল বিভাস। ছেলেটি তার কাঁধের উপর মাথা এলিয়ে রইল। সুরেন ব্যানার্জি রোড ধরে কিছুদূরে যাবার পর ছেলেটি মাথা তুলে একটি বাড়ির সামনে রিক্সা দাঁড়াতে বলল। বেশ বড় বাড়ি। গেট থেকে অনেক খানি দূরে; গেটের একপাশে খেলাধূলার মাঠ অপর পাশে বাগান। দেখা যাচ্ছিল এক ভদ্রমহিলা মালীর সঙ্গে ফুলগাছের তদারক করছেন। দীপক বলল,

'এতখানি যখন করলেন, আমাকে একটু ভিতরে পৌঁছে দিন—'

'চলুন।'

বিভাস ওকে নিয়ে ভিতরের দিকে অগ্রসর হল। ফুলের বাগান থেকে ভদ্রমহিলা উঠে এলেন। 'কী হয়েছে বাবা দীপকের?'—তাঁর গলার স্বরে যথেষ্ঠ আশংকা।

'ভীষণ জ্বর এসেছে মা—' দীপক বলল।

ওর মা আর বিভাস ধরাধরি করে দীপককে উপরের একটা ঘরে শুইয়ে দিল। মৈত্রেয়ী দেবী তাড়াতাড়ি ফোন তুলে ডাক্তারকে কল্ দিলেন। বিভাস বলল, 'আচ্ছা এবার আমি আসি—'

'কী বলে যে বাবা তোমাকে ধন্যবাদ দেবো—' ছেলেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মৈত্রেয়ী দেবী।

দীপক জ্বর-তপ্ত ক্লান্ত চোখ দুটো তুলে বলল, 'আবার আসবেন।

বাড়ি ফিরতে বিভাসের একটু দেরি হয়ে গেল। ফিরে এসে ছাখে বাইরে বেরুবার জন্যে লোপামুদ্রা একেবারে তৈরি। বিভাস বলে, 'কী ব্যাপার দিদি? কোথায় চললে?'

লোপামুদ্রা বলল, 'কাশী যাচ্ছি। ওস্তাদজীর গুরুভাই ডেকে পাঠিয়েছেন। পরীক্ষা কেমন দিলে?'

'পাশ করব মনে হয়—'

লোপামুদ্রা বলল, 'ওস্তাদজীর পীড়াপীড়িতে কাশী যাচ্ছি বটে কিন্তু ওস্তাদজীর শরীরটা বিশেষ ভালো নয়। তুমি ওর দিকে নজর রেখো—'

বিভাস বলল, 'কবে ফিরবে তুমি?'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লোপামুদ্রা বলল, 'কোনো ঠিক নেই। ওখানে একটা জমি কিনেছি হয়তো বাড়ি তুলব—'

সুরজিৎ সিং নিচে মোটর নিয়ে অপেক্ষা করছিল। লোপামুদ্রা গিয়ে উঠতেই সে গেট পার হয়ে চলে গেল। বিভাস সেইদিকে খানিক ক্ষণ চেয়ে থেকে নিজের ঘরে ঢুকে কাপড় জামা ছাড়ল, খেয়ে নিল। আহারের পর চলল ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁর কাছে। শরীরটা অনেকদিন থেকে খারাপ যাচ্ছিল হামিদ হোসেন খাঁর, বিশেষ করে গাইতে গেলে গলার মধ্যে একটা যন্ত্রণা বোধ হয়। ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছেন কিন্তু বিশ্রাম বড়ো একটা নেয় না হামিদ হোসেন। গান বাজনা কমাতে বলেছিলেন ডাক্তার, তা ও শোনে না। যতো বুড়ো হচ্ছে হামিদ হোসেন ততোই যেন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছে। বিভাস তার ঘরে ঢুকে দেখল ওস্তাদ নিজের মনে বীণা বাজাচ্ছে। বড়োই তন্ময় ভঙ্গি। যেন নিজের মধ্যে লীন হয়ে গেছে। কিছু বলল না বিভাস, চুপ করে শুনল। সন্ধ্যা নেমে আসছিল। হামিদ হোসেনের বাজনা শেষ হয়ে গেলে সে বলল, 'ওস্তাদজী ওষুধ খেয়েছ?'

'ওষুধ?—' হামিদ হোসেন যেন বুঝতে পারল না কথাটা। তারপর বলল, 'বেটা, ও খেলেও যা না খেলেও তাই। মিছিমিছি কতকগুলো বিষ গিলে কী লাভ—'

বিভাস রাগ করে বলল, 'লাভ লোকসান তোমায় কে দেখতে বলেছে মুদ্রাদিদি তোমার সব ভার আমার ওপর দিয়ে গেছে। আমি যা বলব তুমি তাই শুনবে—'

হামিদ হোসেন বলল, 'বলো কী করতে হবে?'

বিভাস বলল, 'তোমাকে নিয়ম মতো ওষুধ খেতে হবে আর গান বাজনা যতদূর সম্ভব কমাতে হবে।'

হামিদ হোসেন খাঁর শাদা দাড়িভরা মুখটা করুণ হয়ে উঠল, 'বেটা, তোমার কথা মতো ওষুধ না হয় খাব কিন্তু গান বাজনা ছাড়তে হলে আমি পারব না। ও কথা তুমি বোলো না—'

বিভাস বলল বিচলিত হয়ে, 'ছাড়তে কি বলছি? ডাক্তার বলেছে কমাতে। আর আসরে গিয়ে নাই বা বসলে। ওখানে গিয়ে বসলেই তোমাকে গানের নেশায় পেয়ে বসে—'

হামিদ হোসেন খাঁ করুণভাবে ঘাড় নাড়ল, 'আচ্ছা বেটা তাই হাব।'

কিন্তু মুখে বললেও কাজে ঠিক তার উলটো করতে লাগল হামিদ হোসেন। গলার ভিতর তার যতো যন্ত্রণা হয় ততোই সে গান গায়। ডাক্তার আসেন, ওকে বিশ্রাম আর গান কমাবার কথা বলেন। বিভাস নিজেও অনুরোধ করে। দিনকতক হামিদ হোসেন ঠিক থাকে; লক্ষ্মী ছেলের মতো কথাগুলো মানে। কিন্তু ক'দিন? আবার যে কে সেই। আবার গলার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ে, আবার ডেকে আনতে হয় ডাক্তারকে। মানুষের দুর্ভোগ যখন বাড়ে তখন অপরে কে কি করতে পারে? হামিদ হোসেনের হল তাই।

বিভাস বসে বসে সঙ্গীত শাস্ত্রের একখানা দুরূহ বই পড়ছিল, গঙ্গাধর এসে খবর দিল হামিদ হোসেন আসরে গান গাইতে গাইতে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। বিভাস সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল। বাস্তবিক হামিদ হোসেনের ঠোঁটে-মুখে তখনো রক্ত লেগে রয়েছে। মাথার কাছে বসে হাওয়া করছে তুঙ্গভদ্রা, পায়ের কাছে বিষণ্ণভাবে বসে বিঠলভাই, সরযূপ্রসাদ দাঁড়িয়ে ঘরের মেঝেতে। হামিদ হোসেনের জ্ঞান ফেরেনি, মুখখানা যন্ত্রণায় কুঁচকে রয়েছে। তাই দেখে বিভাস তক্ষুনি ছুটল ডাক্তার ডেকে আনতে।

ফেরার পথে লোপামুদ্রাকে করে দিল একখানা টেলিগ্রাম।...

লোপামুদ্রা এসে গেলে এবং হামিদ হোসেন একটু সুস্থ হয়ে উঠলে বিভাস একদিন চলল দীপকদের বাড়ি। মনটা তার একটু ছাড়া পাবার জন্যে হাঁপিয়ে উঠেছিল। লোপামুদ্রার হাতে হামিদ হোসেনকে সঁপে দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে তার সহসা মনে পড়ে যায় অসুস্থ দীপকের কথা। এতদিন সে কোলকাতায় রয়েছে, কেউ তার বন্ধু নেই, কোথাও সে যায় না। ঘটনাচক্রে একবার আলাপ যখন হয়েছে তখন ওখানে মাঝে-মধ্যে সময় কাটিয়ে আসতে পারে বৈকি! বিশেষ করে ওর মা-টিকে বড় ভাল লেগেছে বিভাসের। কতক্ষণই-বা দেখেছে কিন্তু একেবারে নিখুঁত মাতৃমূর্তি। বিভাস চলল দীপকদের বাড়ির দিকে।

তখন প্রাক-বর্ষার বিকেল। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘের আনাগোনা। বাতাসে গুমোট। বিভাস কি যেন ভাবতে ভাবতে ওদের বাড়ির খোলা-গেট দিয়ে ভিতরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। যেদিকটা খেলার মাঠ তার অপরদিকে ফুলের বাগানের একেবারে শেষাশেষি বড়ো এক কনক চাঁপার গাছ—তাতে একটা দোলনা টাঙিয়ে দুলছিল একটি অপরূপ রূপবতী মেয়ে, আর তাকে দোল দিচ্ছিল সমবয়সী কয়েকটি সঙ্গিনী। বিভাসকে ঢুকতে দেখে সঙ্গিনীদের মধ্যে একজন বলল, 'ওরে মণি,' কে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন—'

দোল খেতে খেতে মেয়েটি বলে, 'তোদের যেমন কাণ্ড! কত বরে বলি গেটটা বন্ধ করে আসবি তা তো শুনবি না। যত উট্‌কো লোক ঢুকে পড়ে—'

করবী বলে, 'একে তো ঠিক উট্‌কো লোক মনে হচ্ছে না! নিশ্চয়ই ভাবুক। দেখছিস-না ভাবতে ভাবতেই চলেছে—আমরা যে এতগুলো অবলা প্রাণা এদিকে রয়েছি সেদিকে কোন খেয়ালই নেই!'

শীলা বলে, 'চিনিস নাকি ওঁকে?'

মেয়েটি বলল, 'না। দাদার কোনো বন্ধু-টন্ধু হবে বোধ হয়। দাঁড়া, আমি আসছি এখুনি। কি চায় দেখি—'

বলে ফুলবাগানের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে সে কাছে আসে: 'কি চাই মশাই? কাকে খুঁজছেন?'

বিভাস সত্যি অন্যমনস্ক ছিল। তার মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে গেল, 'আজ্ঞে আপনাকে নয়—'

'কী বললেন?'

'দীপকবাবু আছেন?'—তখনো সে অন্যমনস্ক।

'না। দাদা বাড়ি নেই—'

'তাহলে সেরে গেছেন নিশ্চয়!'—বিভাস মুখ ঘুরিয়েই চমকে যায়। খুব লজ্জিত হল। বলল, 'মাফ করবেন। আমি ঠিক—'

মেয়েটি গম্ভীরস্বরে বলল, 'আপনি কি অপেক্ষা করবেন? তাহলে ভিতরে গিয়ে বসতে পারেন—'

বিভাস বলল, 'দীপকবাবুর খোঁজ নিতেই এসেছিলাম। অনেকদিন আসতে পারি নি। তিনি যখন সেরে গেছেন তখন বরং আর-একদিন আসব। আজ চলি, আচ্ছা নমস্কার—'

মৈত্রেয়ী দেবী বেরিয়ে এলেন এই সময়।

'ওমা, আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাচ্ছ কী-রকম। বেশ ছেলে যা-হোক—'

বিভাস লজ্জিতভাবে বলল, 'আর একদিন আসব মাসিমা।'

মৈত্রেয়ী দেবী বললেন, 'তা কি হয়! দীপক ফুটবল খেলা দেখতে গেছে এখুনি এসে পড়বে। এসো—'

বিভাস একবার মেয়েটির দিকে একবার মৈত্রেয়ী দেবীর দিকে চেয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে বলল, 'আচ্ছা চলুন।'

মেয়েটি একটুক্ষণ বিভাস ও মৈত্রেয়ী দেবীর গমনপথের দিকে ঠোঁট কামড়ে চেয়ে থেকে ফিরে চলল সঙ্গিনীদের কাছে। করবী মেয়েটি কিছু মুখরা, সে চোখের তারা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে ব্যাপার কি। অত কী বলছিলি ভদ্রলোককে?'

ঠোঁট চেতাল মেয়েটি: 'বলব আবার কী। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেই জানে না। একেবারে অসভ্য—'

শীলা বলল, 'ভাবুক মানুষরা ওরকম হয়।'

'চুপ কর তুই!' মেয়েটি রেগে গিয়ে বলল, 'ভাবুক না হাতি। জিজ্ঞেস করলুম কাকে চাই, উত্তর দিলেন, আপনাকে নয়।'

করবী ওর চিবুক ধরে নাড়িয়ে দিল, 'আহা রে!'

মেয়েটি ওর পিঠে দুম করে এক কিল বসিয়ে দিল।

বিভাসকে সঙ্গে করে মৈত্রেয়ী দেবী উপরের একটি ঘরে এনে বসালেন। আগের দিনের ঘর এটা নয়। বিভাস চারদিকে তাকিয়ে একটু অবাক হল খুশিও হল মনে মনে। ঘরখানা সাজানো-গোছানো তো বটেই নানা রকম বাদ্যযন্ত্রে ঠাসা। হারমোনিয়ম বেহালা গীটার থেকে সুরু করে সেতার পর্যন্ত রয়েছে। বিভাস উঠে গিয়ে দেখল ড্রাগন-মাউথ দামী তরফদার সেতারটি। বলল, 'মাসিমা, এ যে একেবারে জলসার আয়োজন দেখছি!'

মৈত্রেয়ী দেবী হেসে বললেন, 'ব্যাপারটা সেই রকমই বটে। আসছে রবিবার মণির জন্মদিন। তার জন্যেই রোজ রিহার্স্যাল হয় এখানে।'

বিভাস সেতারখানা নেড়ে চেড়ে দেখছিল, বলল, 'সেতার বাজান কে?'

'আমার মেয়ে মণি। ওই যে যার সঙ্গে বাগানে কথা বলেছিলে—'

'আর বেহালা বাজান বুঝি দীপকবাবু?'

'না। বেহালা বাজান মণির বাবা। মেয়ের জন্মদিনে তাঁরই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। তিনি আসেন সন্ধ্যের পর—তখন জমে ওঠে ওদের রিহার্স্যাল। সেতার বাজায় মণি, বেহালা বাজান ওর বাবা, তবলা বাজায় সুপ্রিয়। আরো অনেকে আসে। গীটার বাজায় অন্তরা, নাচে আরতি ও ভারতী দুই বোন।'

'দীপকবাবু কিছু বাজান না?'

মৈত্রেয়ী দেবী বললেন, 'অনেক চেষ্টা করেও ওকে কিছু শেখাতে পারেননি উনি। দীপক শুধু বোঝে খেলাধুলা। বিকেল হলেই ওকে পাবে মাঠে। তুমি বসো বাবা, ওরা এখুনি এসে পড়বে—'

মৈত্রেয়ী দেবী চা করতে চলে যান। বিভাস যন্ত্রগুলো নাড়াচাড়া করে ফিরে এসে বসে চেয়ারে। টেবিলের বইগুলো উলটে পালটে

ছাখে। বইয়ের ভিতরে দেখতে পায় টানা ইংরেজীতে লেখা: পূরবী মিত্র, রিপন কলেজ, ফার্স্ট ইয়ার। এই মেয়েটি যে কে সে বুঝতে পারে না। অশোভন কৌতুহল সে দমন করে। দেখতে পায় পাঠ্যপুস্তকের ভিতর একখানা সঙ্গীত সংক্রান্ত বাংলা বইও রয়েছে। তাতেও লেখা 'পূরবী মিত্র'। বইটার পাতা উলটিয়ে যায় সে। বিভাস নিজেও অনেক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শাস্ত্রীয় বই কিনেছে, তার মধ্যে এ বইখানিও আছে। বসে থাকতে থাকতে তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে বাগানে দেখা মেয়েটির মুখচ্ছবি। অপূর্ব সুন্দর মুখ। মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে তার চোখ যেন ঝলসে গিয়েছিল। প্রথম দর্শনেই তার মনে হয়েছে মেয়েটি যেন মীড় গমকে ঠাসা একটি অপূর্ব রাগিণী। এমন তান ভরা শরীর সে আগে কখনো ছাখেনি, এত সুর-ভরা কথা সে আগে কখনো শোনেনি। বিভাস যেন শরীর আর সঙ্গীতের কোন তফাৎ খুঁজে পায়না মেয়েটিকে দেখে।

মৈত্রেয়ী দেবী চলে গেছেন, ফাঁকা ঘর। ঘরে আলো ঝিমিয়ে এসেছিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বিভাস উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়ায়। তখনো কণকচাঁপার গাছে দোলনা দুলছে আর অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে হাসির টুকরো। সে দেখতে পায় মেয়েগুলি গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর একে একে বিদায় নিচ্ছে মণি নামে মেয়েটির কাছ থেকে। মণি সম্ভবত ওদের আবার আসবার জন্যে মনে করিয়ে দিচ্ছে। ওরা ঘাড় নেড়ে চলে যায়। মণি দাঁড়িয়েছিল একা। এমন সময় দুটি ছেলেকে দেখা গেল। ছেলে দুটির সঙ্গে হাসতে হাসতে মণি বাড়ির ভিতরে আসতে লাগল।

বিভাস ফিরে এসে বসল চেয়ারে। শুনতে পেল সিঁড়িতে তিন জোড়া পায়ের শব্দ। হাসতে হাসতে উঠে আসছিল দীপক, সুপ্রিয় আর মণি। সেই সময় চা আর খাবারের প্লেট নিয়ে মৈত্রেয়ী দেবীও আসছিলেন দালান পার হয়ে। দীপক দরাজ গলায় হাঁক দিল, 'ও কি মা, ফাঁকা-মাঠে কাপ-ডিস নিয়ে ঢুকছো কেন? আমরা সবাই তোমার পিছনে—'

মৈত্রেয়ী দেবী হেসে বললেন, 'মাঠ যে ফাঁকা তা তুই কি করে বুঝলি? মাঠে আগে ঢোক্—'

দীপক বলল, 'কে এসেছে মা?'

'ঢুকলেই দেখতে পাবি। আগে থেকে বলব কেন?'

কিন্তু ঘরে ঢুকে ওরা সবাই চুপ করে রইল দেখে মৈত্রেয়ী দেবী আবার বললেন, 'কিরে, চিনতে পারলি নে? অথচ এক নজরেই তুই মাঠের খেলোয়াড়দের চিনতে পারিস—'

দীপক সত্যি চিনতে পারছিল না। বলল, 'আই বেগ্ ইয়োর পার্ডন মাদার—' তারপর যেন তার স্মৃতিপট ঝলসে উঠল, 'ইয়েস। মনে পড়েছে। আচ্ছা, সেদিন আপনিই কি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন?'

বিভাস হেসে বলল, 'হ্যাঁ—'

'বুঝুন। অত জ্বরের ঘোরে একবার মাত্র আপনাকে দেখেছি, তবু ঠিক চিনতে পেরেছি। মা, এক কাপ ডব্ল হাফ চা—'

মা বললেন, 'তোরা আলাপ পরিচয় কর্, আমি চা নিয়ে আসছি।'

দীপক বলল, 'আলাপ-পরিচয়ের প্রথম সূত্র হল নাম। আমার নাম শ্রীদীপক মিত্র—'

বিভাস বলল, 'আমার নাম শ্রীবিভাস মুখোপাধ্যায়।'

সুপ্রিয় বলল, 'আমি শ্রীসুপ্রিয় বিশ্বাস।'

মণি বলল, 'আমি শ্রীপূরবী মিত্র।'

মৈত্রেয়ী দেবী বললেন, 'জানিস মণি, বিভাসও গান-বাজনার ভক্ত।'

পূরবী বলল, 'তাই নাকি? সামনের রবিবারে আমার জন্মদিন। আপনি আসবেন বিভাসবাবু।'

বিভাস বলল, 'আসব।'

ঘরোয়া জলসার ব্যাপারে ওদের বাবা শ্রীযুক্ত পরাশর মিত্র মহাশয়েরই আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল সব চেয়ে বেশী। ছেলেবেলা থেকেই তিনি গান-বাজনার ভক্ত। কিন্তু সংসারের নিষ্ঠুর চাপে নিয়মিত সংগীত চর্চা তিনি করতে পারেননি, এই ক্ষোভ তাঁর মনে বরাবরই ছিল।

নিজে বহু কষ্টে সামান্য বেহালা শিখে ছিলেন, ইচ্ছা ছিল ছেলের উপর দিয়ে তাঁর অপূর্ণ সাধ মেটাবেন কিন্তু দীপকের মতিগতি অন্যদিকে দেখে তিনি মেয়েকেই টেনে আনলেন এ-পথে। প্রথমে কণ্ঠসঙ্গীতের জন্যে একজন মাষ্টার রাখেন, পরে ধরান সেতার। কিন্তু মেয়ের একটি জিনিষ তাঁর পছন্দ নয়, অনেক বুঝিয়েও মেয়েকে তিনি রেশারেশির হাত থেকে রক্ষা ক'রতে পারেননি। পূরবীর সেতার মানে লয়ের লড়াই।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বন্ধু আদিত্যবাবুর সহযোগিতাতেই পরাশর বাবুর আজ এমন বাড় বাড়ন্ত। আগে খুচরা চায়ের কারবার ক'রতেন তিনি। আদিত্য বাবু তার ভিতর ঢুকে কারবারটিকে ফাঁপিয়ে তুললেন। বিরাট একটি চায়ের কারবার আজ 'মিত্র এণ্ড বিশ্বাস কোম্পানী'-র নামে চালু। আদিত্য বাবুরই ছেলে সুপ্রিয় বিশ্বাস। দুই পরিবারের গভীর হৃদ্যতায় গোপনে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যে পূরবী ওদের বাড়িতে মেয়ের মতো আর সুপ্রিয় এ-বাড়ীতে ছেলের মতো আদর যত্ন পায়। পূরবী সেতার বাজায় আর সুপ্রিয় তার সঙ্গে তবলা বাজায়— এই দেখেও দুই পরিবারের মন খুশি থাকে। কিন্তু সুপ্রিয় ছেলেটি বড়ো নিরীহ আর কথা বলে স্বল্প। তার দিকে তাকিয়ে এক-এক সময় হতাশ হয়ে পড়েন পরাশর বাবু, মনে হয় ছেলেটি বড় নিরুত্তাপ। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি।

এক সপ্তাহ বাকি ছিল পূরবীর জন্মদিনের। বাড়ীতে একটু সঙ্গীতের আবহাওয়া সৃষ্টি চান পরাশর বাবু। উপর্যুপরি কয়েকদিন সকাল সকাল কারবার থেকে ফিরে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। দলটিও নেহাত ছোট হয়নি। পূরবীর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আরতি ও ভারতী নামে দুই বোন নাচ দেখাবে, শীলা ও করবী রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে, ইরা মাধবী গাইবে আধুনিক গান, সুপ্রিয়র বোন অন্তরা বাজাবে গীটার, একজন হাস্য কৌতুক পরিবেশন করবে, পরাশরবাবু বেহালা বাজাবেন এবং সব শেষে পূরবী বাজাবে সেতার। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে এই প্রোগ্রামের শেষে যথারীতি আহারাদির ব্যবস্থা। কদিন সুপ্রিয় আর দীপক খুব খাটল। পরাশরবাবু তদ্বির তদারক করলেন।

রবিবারে সন্ধ্যার পর থেকেই অতিথি-অভ্যাগতরা আসতে লাগলেন। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পরাশরবাবু অভ্যর্থনা করতে লাগলেন সবাইকে। মেয়ের জন্মদিনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস তাঁর মনেও লেগেছে। আদিত্যবাবু এবং তাঁর স্ত্রী এলেন। মেয়ে অন্তরা এল গীটার হাতে। আধুনিকতার উগ্র পোশাক তার অঙ্গে। চাল-চলন কথাবার্তা সবেই তার এই উগ্রতা সুস্পষ্ট। পূরবীর সে সমবয়সী। একই সঙ্গে পড়ে এবং দুজনে দুই বিপরীত মেরু, খিটিমিটি লেগেই আছে। মোটর থেকে নেমেই অন্তরা বলল, 'মণি আমার প্রোগ্রামটা ভাই একটু তাড়াতাড়ি দিয়ে দিবি, আমার আবার আর এক জায়গায় ফাংশান আছে।' পূরবী বলল, 'বেশ তো তুই আগেই বাজিয়ে নিস। কিন্তু সুপ্রিয়দা এখনো আসছে না কেন?' অন্তরা বলল, 'দাদার শরীর খারাপ আজ সকাল থেকে। তবে আসবে বলেছে।'

বাস্তবিক সুপ্রিয় সম্বন্ধে দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়েছিল পূরবী। কদিন ধরে যা খাটাখাটুনি করেছে তাতে শরীর খারাপ হওয়া বিচিত্র নয় কিন্তু আজকের দিনে সে সুস্থ না থাকলে সব মাটি। এতদিনের রিহার্স্যাল— তাছাড়া আর কে বাজাবে ওর সঙ্গে। পূরবী আশ্বস্ত হল গেট দিয়ে সুপ্রিয় আর বিভাসকে ঢুকতে দেখে। বিভাসের হাতে রজনীগন্ধার একটি তোড়া আর রাগ সঙ্গীতের একটি মোটা বই ছিল। সে ও-দুটো পূরবীর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'আপনার জীবন সঙ্গীতময় হোক, আপনার জীবন পবিত্র হোক,—আজকের দিনে এই প্রার্থনা করি।'

অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে বেশি দেরি ছিল না। পরাশরবাবু একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হল আরতি ও ভারতীর নাচ দিয়ে—'সঙ্গীতের জন্ম'। পরিকল্পনা পূরবীর নিজের। খুব প্রশংসা পেল নাচটি। নাচের পর পরাশরবাবু বেহালায় বেহাগের আলাপ বাজিয়ে শোনালেন। শীলা আর ইরা রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আধুনিক গেয়ে শোনালো, করবী ও মাধবী গাইল তারপর। মাঝখানে হয়ে গেল অন্তরার গীটার। হাস্যকৌতুক হচ্ছিল, এই অনুষ্ঠানের পরই হবে পূরবীর সেতার। সুপ্রিয় উঠে পড়ল। পূরবীকে বাইরে ডেকে নিয়ে

গিয়ে বলল, 'মণি, আমার শরীরটা খারাপ করছে, বোধহয় জ্বর এসেছে।'

পূরবী বলল, 'সে কি! তাহলে—'

সুপ্রিয় বলল, 'আমি বিভাসবাবুকে বলেছি, তিনি তোমার সঙ্গে বাজাবেন। উনি তবলা জানেন।'

'তুমি কি সত্যিই পারবে না বাজাতে?'

'পারলে কি এভাবে চলে যাই মণি? তোমার সঙ্গে বাজাবার আনন্দটাই আমার সবচেয়ে বড়, তা তুমি জানো। আমি বিভাসবাবুকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি—'

সুপ্রিয় বিভাসকে ডেকে এনে বলল, 'এরপরই তোমার অনুষ্ঠান। বিভাসবাবু তোমার সঙ্গে বাজাবেন। আমি চললাম মণি—' সুপ্রিয় শিথিল পায়ে চলে গেল ওদের সামনে থেকে। পূরবী ওকে এগিয়ে দিয়ে এল গেট পর্যন্ত। এই আকস্মিক সংগতকার পরিবর্তনে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তারপরই মনে পড়ল সেইদিনকার কথাটির জবাব দেবার এই হল উপযুক্ত সুযোগ। 'কে কার খোঁজ করে' এই বারে মালুম করে দেওয়া যায়। পূরবী তাকাল বিভাসের দিকে। খোলা পাঞ্জাবী ও লম্বা ধুতিতে উন্নত দীর্ঘ শরীর, যেন একটি অকপট আত্ম-প্রকাশ। মনে হল এও বুঝি সেই অহমিকা। তাই মনে মনে বেশ শক্ত হয়ে পূরবী জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তো সেতার বাজাতেও পারেন, তাই না বিভাসবাবু?'

'পারি।'

'আমার সঙ্গে তবলা বাজাতে পারবেন?'

'যদি অনুমতি করেন—'

'বেশ। আসুন।'

হাস্যকৌতুক তখন শেষ হয়ে গেছে। ওরা আসরে গিয়ে বসল। পূরবী তার বেঁধে নিল সেতারের, বিভাস ঠিক করে নিল তবলা। সুপ্রিয়র পরিবর্তে বিভাসকে মঞ্চে দেখে পূরবীর বান্ধবীদের মধ্যে ফিসফাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। করবী বলল, 'চুপ কর্ না। আজ

একটা কাণ্ড হবে। পূরবী যখন বাগে পেয়েছে তখন অসভ্যটাকে টিট করে ছেড়ে দেবে—'

প্রথমেই তেমন বোঝা যায়নি। বেশ ধীরে সুস্থেই আলাপ থেকে গৎ-এ পড়ল পূরবী। তারপরই করবীর কথা যেন সত্যি হয়ে উঠল। এক বার করে আস্থায়ী ধরে পূরবী আর লম্বা তান তুলে সম এ এনে ফ্যালে, তেহাই-এ তেহাই-এ খই ফোটায়। তার আক্রোশ স্পষ্ট বোঝা গেল তবলচিকে জবাবের কোনো সুযোগ না দেওয়ায়। বিভাস কিন্তু আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে ওর সঙ্গে তবলা বাজিয়ে গেল। দু'একবার জবাব দেবার ফাঁক যে সে পায়নি তা নয় কিন্তু পূরবীর উত্তেজনা' ও উদ্দেশ্য সে আগেই টের পেয়েছিল। তার রক্তেও ক্ষণিকের জন্যে দোলা লেগেছিল কিন্তু কানের কাছে বেজে উঠেছিল বিঠলভাই-এর সাবধান বাণী। বিঠলভাই তাকে একদিন বলেছিল, 'বিভাস ভাই, সঙ্গীতে রেশারেশি ভালো না। ওস্তাদজী বলেন, রেশারেশি ক'রে যারা রাগকে খারাপ করে সুরকে জখম করে, খোদার কাছে তারা গুনাহ্ করে। ও কাজ কখনো কোরো না বিভাসভাই।' তবু ওর হাতে যে নানা রকমের বাজ লুকিয়ে আছে এটি উত্তেজনার মুখে পূরবী বুঝতে না পারলেও তার বাবা পরাশরবাবু ঠিক ধরতে পারলেন। তিনি মনে মনে শংকিত হয়ে উঠলেন এই ভেবে যে ছেলেটি যদি কোনোপ্রকারে তার ধৈর্য রাখতে না পারে তাহলে এত লোকের সামনে পূরবী নিদারুন অপদস্থ হবে। কিন্তু তিনি খুশি হলেন ছেলেটির অসীম ধৈর্য দেখে। পূরবী তখন লয় বাড়িয়ে ঝালায় গিয়ে পড়েছে এবং উন্মত্তের মতো ক্রমাগত লয় বাড়িয়ে চলেছে। সমস্ত ঘরটায় সেতার আর তবলা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কিছুই বোঝা যায় না, শুধু সেতারের ঝন ঝন আওয়াজ আর তাবলার গোটা গোটা বোল ছাড়া। পূরবী হাঁপিয়ে গিয়েছিল, বিভাস তখনো অনায়াস। কিন্তু বাজনা হয়ে গেলে পূরবীর বান্ধবীরা ভূয়সী প্রশংসা করল পূরবীরই বাজনার। বিভাস নেমে এল মঞ্চ থেকে।

খাওয়ার টেবিলে পরাশর বাবু বসলেন বিভাসের পাশেই। খেতে খেতে অনেক কথা জেনে ফেললেন তিনি বিভাসের। তাঁর ভালো লাগল

ছেলেটিকে। তিনি আবার আসতে বললেন তাকে। বিভাস বলল যে সে আসবে। রাত হয়ে যাচ্ছিল। খাওয়া দাওয়ার পর একে একে সবাই বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। বিভাসও বিদায় নিল পরাশর বাবু আর মৈত্রেয়ী দেবীর কাছ থেকে। একবার সে খুঁজে দেখল পূরবী আছে কিনা। নেই দেখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দীপক ব্যস্ত ছিল অতিথিদের নিয়ে। ওর সঙ্গে কথা বলে বিভাস নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির ঠিক নিচে বান্ধবীদের সঙ্গে কথা বলছিল পূরবী। নামতে নামতে বিভাস শুনতে পেল একটি মেয়ে বলছে, 'সত্যি, আজ তুই যা বাজালি যেন আগুন ছুটিয়ে দিয়েছিস্।'

করবী বলল, 'যাই বল, অসভ্যটাকে কিন্তু খুব টিট করে দিয়েছিস আজকে!'

পূরবী বলল, 'আমার বাজনা ভালো লেগেছে তোদের?'

শীলা বলল, 'কী যে বলিস! তুই নাম দে অল্ বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে, নির্ঘাৎ ফার্স্ট হবি—'

অলকা বলল, 'চুপ চুপ। বিভাস বাবু আসছেন—'

বিভাস নেমে এসে ওদের নমস্কার জানিয়ে সোজা নেমে পড়ল রাস্তায়। তার কানের পাশ দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছিল।

লোপামুদ্রা ফিরে এসে হামিদ হোসেনকে ঠিকমতো সামলাতে পারছিল না। সে কারো কথাই শুনবে না। কেবলই বলে, 'বেটি আমার গান চলে গেলে আর কী রইল?' সে মাথার উপর থেকে সারেংগীটা পেড়ে নেয়। কখনো বীণা তুলে নিয়ে আলাপ করতে থাকে রাগ-রাগিণীর। ওর অস্থিরতা বোঝে লোপামুদ্রা। তাড়াতাড়ি সে ডেকে আনে বিভাসকে। বলে, 'ওস্তাদজিকে তুমি সেতার বাজিয়ে শোনাও—'হামিদ হোসেনকে বলে, 'ওস্তাদজি, তুমি ছাখো বিভাস ঠিক-ঠিক বাজাতে পারছে কিনা? দুদিন পরে ও-ই তো তোমার নাম রাখবে—' হামিদ হোসেন কি-রকম একটা অদ্ভুত চোখে ওদের দুজনের পানে তাকায়। নিজের মনেই সে বলে, 'আমাকে এমনি করে কতদিন আগলে রাখবি? আমার প্রাণ যে হাঁপিয়ে উঠছে!' বিভাসকে বলে, "আচ্ছা বেটা, তুমি বাজিয়ে শোনাও—' বিভাস বাজায় হামিদ হোসেন শোনে। বাজনা শেষ হয়ে গেলে ফের উসখুস করে হামিদ হোসেন। লোপামুদ্রা তখন বলে, 'আচ্ছা বিভাস, এই আশাবরীর রূপটি বলো।'

বিভাস বলে,

'শ্রীখণ্ড শৈলশিখরে শিখিপুচ্ছবস্ত্রা
মাতংগমৌক্তিক মনোহরহারবল্লী।
আকৃষ্ণ চন্দনতরোরুরগং বহন্তী
আশাবরী বলয়মুজ্জ্বলনীলকান্তিঃ॥'

এই প্রসঙ্গটি যাতে শেষ হয়ে না যায় তারজন্যে লোপামুদ্রা ওর উৎপত্তির বিবরণ শুনতে চায়। বিভাস জানায় আশাবরীর ঠাট আশাবরী। ধৈবত আর নিষাদ কোমল, বাদী ধৈবত, সংবাদী গান্ধার। আরোহনে গ-নি বর্জিত, অবরোহণ সম্পূর্ণ, সুতরাং জাতি হল ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আবার কোমল ঋষভ ব্যবহার করেন কেউ কেউ। উত্তরাংবাদী রাগ। দেশী গান্ধারী আর টোড়ীর সংমিশ্রণে এর সৃষ্টি. কারো কারো মতে ভৈরব কেদারা গৌরী সিন্ধুরা গান্ধারী দেবগিরি ধনাশ্রী আর কানাড়ার সংমিশ্রণে ইনি সৃষ্টি হয়েছেন। গায়কী সময় বেলা দ্বিপ্রহর—'

আবার হয়তো বাজাতে হয় বিভাসকে। বাইরে আকাশে মেঘের

ঘনঘটা, ঝিরঝির করে হয়তো বৃষ্টি নেমেছে। হামিদ হোসেন শুনতে চায় মল্লার; শুধু আলাপ নয় গৎ-তোড়া সমেত সম্পূর্ণ রাগ। বিঠলভাইকে ডেকে আনতে হয়। অনেকক্ষণ বাজনা চলে। লোপামুদ্রা আবার তাকে রূপ ব্যাখ্যা করতে বলে। বিভাস জানায়,

'গৌরী কৃশা কোকিলকণ্ঠনাদা
গীতচ্ছলেনাত্মপতিং স্মরন্তি।
আদায় বীণাং মলিনা রুদন্তি
মল্লারিকা যৌবনদূনচিত্তা॥

উৎপত্তির বিবরণ দিতে গিয়ে বলে, কাফি ঠাট থেকে মল্লার বা মল্লারিকার জন্ম, কেউ কেউ খাম্বাজ ঠাট থেকেও বলেন। ঋষভ বাদী, সংবাদী হল পঞ্চম। মেঘ টোড়ী আর সারংগের সংমিশ্রনে ইনি উৎপন্ন হয়েছেন বলে একদলের ধারণা অন্যদল বলেন, সারংগ সুরট বিলাবল বা নট এবং মেঘের সংমিশ্রণে মল্লারের সৃষ্টি। আরোহণে গ-নি বর্জিত অবরোহণে গ বর্জিত। তাই ঔড়ব ষাড়ব জাতি।

হামিদ হোসেনকে এইভাবেও বেশিক্ষণ চুপ করিয়ে রাখা যায় না। সে চুপ করে শুয়ে থেকে এক সময় চোখ খুলে বলত, 'বেটা রাগ রাগিনীর পরিচয় তো শুধু এই ভাবেই পাওয়া যায় না, আরো যে পথ আছে। জানো, আমি যখন কোনো রাগের পরিচয়ের কথা ভাবি তখন আমার চোখের সামনে তার দুটো রূপ ফুটে ওঠে। একটা হল, তার নাদময় বা স্বরময় রূপ, অন্যটা হল ভাবময় রূপ। ধরো পূরবী। এই রাগে সবগুলি স্বর ব্যবহার করতে হয়, এতে রেখাব কোমল ধৈবত কোমল আর মধ্যম তীব্র ও শুদ্ধ দুইই। তাছাড়া শুদ্ধ মধ্যমের বিশিষ্ট ব্যবহার এতে যেমন আছে তেমনি আছে বিশেষ স্বরের অনুক্রম। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় নিয়মের ব্যতিক্রম দেখতে পাই। তখন মনে নানা রকমের সন্দেহ হয়। যেমন ধরো নিয়ম লংঘন না করলে পূরবীর যে রূপ দাঁড়ায় তা হল—'

বলে' গাইতে যাচ্ছিল হামিদ হোসেন, লোপামুদ্রা তাড়াতাড়ি বলে-

'আমি বলছি ওস্তাদজী :

স, ন্ ঋ গ ঋ গ, হ্ম প, হ্ম গ ম গ,

গ ঋ গ, ন্ ঋ স | স ন্ ঋ স,

ঋ ম গ, হ্ম প দ হ্ম প, গ ম হ্ম গ,

ঋ গ ঋ স।'

হামিদ হোসেন বলল, 'বেশ। কিন্তু আমি যদি বলি :

স র গ, হ্ম প হ্ম, গ ম গ, র ম গ,

রগ স | ন্ র গ, হ্ম প, ধ হ্ম প,

হ্ম স', র্স ন ধ প, হ্ম গ ম হ্ম গ,

রগ, র স।

তাহলে এটাকে তুমি কি বলবে বিভাস বেটা ?'

বিভাস বলল, 'ওস্তাদজী এতে ইমনকল্যাণের স্বরগুলি লেগেছে কিন্তু এটাও পূরবী।'

'কি করে বুঝলে ?'

বিভাস উত্তর দেয়, 'এর চলন দেখে—'

হামিদ হোসেন খুশি হয়, বলে, 'হাঁ। মনে রাখবে সব সময় গানের স্বর নিয়ে বিচার করা যায় না, রাগের গতিবিধির দিকটাও নজর রাখা দরকার। এইজন্যেই রাগের স্বরময় রূপের সঙ্গে ভাবময় রূপের কথাও চিন্তা করতে হবে। মুদ্রা-বেটি তোমাকে অনেক শিখিয়েছে দেখছি!'

কোনোদিন হয়তো লোপামুদ্রাকে গাইতে হয় ধ্রুপদ। বিভাসকে বলতে হয় সেটি ধ্রুপদের কোন্ বাণী এবং শোনাতে হয় ধ্রুপদের চারিটি বাণীর ইতিহাস। সে বলে, 'গওহার বাণী প্রবর্তন করেন মিয়া তানসেন। এই বাণীতে আছে যেমন শান্ত রস, এর গতিও তেমনি ধীর ও নম্র। খাণ্ডার বাণীর প্রবর্তক হলেন মিশ্রী সিং যাঁর আরেক নাম নারাৎ খাঁ— এঁর নিবাস ছিল খাণ্ডারে এবং সেই কারণেই এই বাণীর নাম হয়েছে খাণ্ডার বাণী। এর মধ্যে আছে তীব্র রস আর গতিও বিলম্বিত নয়। ডাগরবাণী যিনি উদ্ভাবন করেন তিনি একজন ব্রাহ্মণ, নাম ব্রীজ চন্দ,

ইনি যেখানে বাস করতেন সেই জায়গাটির নাম ছিল ডাগুর—সেইজন্যেই এই বাণীর নাম হয়েছে ডাগুরবাণী বা ডাগরবাণী। লালিত্য ও সারল্যই হল এই বাণীর প্রধান গুণ, এর গতি যেমন সহজ তেমনি সরল। আর নওহার বাণী যিনি প্রবর্তন করেন তিনি হলেন বাদশা আকবরের এক রাজপুত সভাসদ, নাম তাঁর শ্রীচন্দ। নওহার বাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এক সুর থেকে আর-এক সুরে বাঘের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়া—'

হামিদ হোসেন বলে, 'শোনাতে পার আমাকে একটা।'

বিভাস সেতার তুলে নিতে যাচ্ছিল, লোপামুদ্রা বলে, 'আমি শোনাচ্ছি।'

হামিদ হোসেন হাসি-হাসি মুখে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে।...

আসর ভেঙে গেলে অনেক রাত্রে আসে তুঙ্গভদ্রা। সে এসেই বলে, 'এবার আমি গান শোনাব, তোমরা যাও এখান থেকে।'

তুঙ্গভদ্রার গান মানে ঠুংরী। তার পায়ে ঘুঙুর বাঁধা থাকে, নাচে আর গান ধরে, 'পিয়া বিনা নাই আওয়ত চয়েন—' প্রিয় ছাড়া ঘুম আসছে না। বুড়ো হামিদ হোসেনের রসিক-মন উদ্বেল হয়ে ওঠে, সে শুয়ে শুয়ে চোখ পিট পিট করে তুঙ্গভদ্রার দিকে চেয়ে থাকে আর গান শোনে। কোনোদিন থাম্বাজে ধরে,

'সাঁচই কহো মু সে বাতিয়া
মাধব মুরারি কাঁহা গামায়ও
সারি রাতিয়া—'

কোথায় সারা রাত কাটালে, মাধব মুরারি, আমাকে সত্য করে বল। বেশ দরদ দিয়ে নিখুঁত স্বর-বিন্যাসে গানটির অন্তর্নিহিত ভাব ও রস সে ফুটিয়ে তোলে। তার গানের মধ্যেই প্রথমে ঢোকে সরযূপ্রসাদ তার-পরে বিঠলভাই—যেন দুজনেই প্রতিবাদ করে, কোথায় আর কাটাব,

তোমার কাছ ছাড়া। ভিতরে ঢুকে বিঠলভাই তবলা নিয়ে বসে আর সরযূপ্রসাদ সারেংগী নিয়ে। দুজনেই বাজাতে থাকে তুঙ্গভদ্রার নাচ ও গানের সঙ্গে। হামিদ হোসেনের অসুস্থ বিষণ্ণ ঘরটা যেন নাচে ও গানে মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু কেউই লক্ষ্য করে না সারেংগী আর তবলার মধ্যে কখন্ একটি অদৃশ্য রেশা রেশি শুরু হয়ে গেছে তলে-তলে। সেদিনও বিঠলভাই চাপা উত্তেজনা নিয়ে মিঠে হাতে তবলা বাজাচ্ছিল আর সারেংগী ছাড়ছিল সরযূপ্রসাদ। বাজাতে বাজাতে ফেঁসে গেল বিঠলভাইয়ের তবলা আর সরযূপ্রসাদ হেসে উঠল হোঃ হোঃ ক'রে। তুঙ্গভদ্রা নাচ থামিয়ে কোমরে হাত দিয়ে পায়রার মতো উঁচু বুক ঠেলে বিদ্রুপে ঝিকিয়ে উঠল, 'কি গো মোটা হাতি, এটা কি কুস্তির আখরা পেলে, নাকি কোন পালোয়ানী দোস্ত ঠাউরালে তবলাটাকে—'

আবার হেসে উঠল সরযূপ্রসাদ। হামিদ হোসেনের ঘুম এসে গিয়েছিল, সে ঘুম চোখ খুলে বলল, 'ক্যা হুয়া বেটি?' আবার ঘুমিয়ে পড়ল। বিঠলভাই ততক্ষণে মুখ লাল করে উঠে পড়েছে আর চলে গেছে ঘর হতে। মনের ভিতরে একটা ভয়ংকর অপমানের জ্বালা থমথম করছিল। রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে সে পিছন ফিরে দেখতে পেল ঘরের ভিতরে সারেংগী ও নাচ পরস্পর কথাবার্তা বলছে আর হাসা হাসি করছে। সরযূপ্রসাদ তুঙ্গভদ্রার একটি হাত জড়িয়ে ধরেছে, তুঙ্গভদ্রা চোখে ও মুখে হাসি ফুটিয়ে হাতটি ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। দুজনে একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে কথা বলছে। বোধহয় দরজার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখতে পেল তুঙ্গভদ্রা, হাতটি ছাড়িয়ে নিয়ে চোখের ইসারা করে গাইতে লাগল: 'জরা ধীরেসে বোল্ কোই শুন্ লেগা—'

অসহ্য! বিঠলভাই রেলিঙের কাছ থেকে চলে গেল।

'জরা ধীরে সে বোল্ কোই শুন্ লেগা—' এ-রকম ব্যঙ্গ করে না বললেও বিঠলভাই এতদিনে যা শোনবার ঠিকই শুনেছে। সে কুৎসিত হতে পারে মোটা হাতি হতে পারে কিন্তু তারও একটা অনুভূতি-প্রবণ মন আছে। সেই মনের চোখ দিয়ে সে অনেক কিছু দেখেছে এবং বুঝেছে,—তারই জ্বালায় সে আজ কাল ঘুমুতে পারে না কোন রাত্রেই। সরযূপ্রসাদ

ইদানীং বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, এখানেই থাকে রাত্রিবেলা।' কেন সে থাকে, কোথায় রাত্রিটা কাটায়—নিঃসঙ্গ একা ঘরে শুয়ে বিঠলভাই সবই বোঝে। সিঁড়ির পাশে ছোট একটা ঘর ছিল, সেইটাই হয়েছে সরযূপ্রসাদের রাত্রি যাপনের আস্তানা। কিন্তু বাড়ি একেবারে নিঝুম হয়ে গেলে, নিশীথ-রাত্রির অন্ধকার আরো চেপে বসলে, নিদ্রাহীন বিঠলভাই শুয়ে শুয়ে যেন স্পষ্ট শুনতে পায়, একটি লোভী পদক্ষেপ দালান পার হয়ে ধীরে ধীরে একটি পায়রা উঁচু বুক নাচওয়ালীর ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে। কান সে খাড়া করে রাখে না তবু যেন শুনতে পায়। শুনতে পায়, ওদিকের কোণের ঘরের দরজায় মৃদু টোকার আওয়াজ-টুকুও। তখন বাকিটুকু কল্পনা করে নিতে গিয়ে তার চওড়া বুকের ভিতর যেন জ্বলে-পুড়ে যায়। বিঠলভাই ঘুমুতে পারে না কিছুতেই, সারা রাত্রি ছটফট করে।

সেদিন গভীর রাত্রে আচমকা বিছানায় উঠে বসল বিঠলভাই। সে যেন শুনতে পেল, ঠিক সিঁড়ির উপর কিসের একটা শব্দ হল। কারো হাত থেকে ভারি কিছু পড়ে গেল যেন। তবে কি কেউ কিছু চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে? বিঠলভাই সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ছুটে এল বাইরে, সিঁড়ির মুখে। সত্যি চুরি হয়ে যাচ্ছে একটা জিনিস—এ বাড়ির সেরা সম্পদ তুঙ্গভদ্রা। তুঙ্গভদ্রার হাত ধরে দ্রুত পায়ে নেমে যাচ্ছে সরযূপ্রসাদ। তার হাতে একটা ভারি স্যুটকেশ, হয়তো তারই ঠোকর লেগে থাকবে সিঁড়িতে। বিঠলভাই চিৎকার করে উঠল, 'ভদ্রা, যেও না, যেও না, সরযূপ্রসাদ একটা পাকা শয়তান। শয়তানের খপ্পরে প'ড়ো না ও তোমাকে শেষ করে ফেলবে—'

বলে সেও দ্রুত পায়ে নেমে এসে চেপে ধরল তুঙ্গভদ্রার একটা হাত।

তুঙ্গভদ্রা আতংকে চেঁচিয়ে উঠল, 'সরযূপ্রসাদ, বাঁচাও—'

বলার অপেক্ষামাত্র। সরযূপ্রসাদ চোখের নিমেষে ছোরা বার করে আমূল বসিয়ে দিল বিঠলভাইয়ের কাঁধে।

বিঠলভাই লুটিয়ে পড়ল সিঁড়ির বুকে।

ওরা বেরিয়ে গেল।

তালতলা বাজার স্ট্রীটের একটু ভিতরের দিকে ছোট একটি সুন্দর বাড়ি। নতুন রঙ করেছেন আদিত্যবাবু। ঠাসাঠাসি ঘিঞ্জি বাড়িগুলোর পটভূমিকায় তাঁর বাড়িটি যেন একটা স্বতন্ত্র আভিজাত্য রক্ষা করছে রঙে এবং প্যাটার্ণে। সামনে জমি নেই একেবারে। গলিটাও সরু। ছোট গেট ঠেলে একেবারে ভিতরে ঢুকতে হয়। উপর নিচে ছ' খানা ঘর। অন্তরা থাকে উপরের একটা ঘরে, সুপ্রিয় নিচে। সুপ্রিয় ডাক্তারী পড়ে আর অবসর সময়ে তবলা বাজায়। ঘরে ডাক্তারী বইয়ের সঙ্গে এক জোড়া ডুগি-তবলাও ছাখা যায় সযত্নে রক্ষিত আছে। বেশ কিছুদিন অসুখে ভুগে এখন সেরে উঠেছে সুপ্রিয়, পথ্য পেয়েছে আজ। আষাঢ় মাসের বিকেল। গলির মধ্যে আলো এমনিতেই ঝিমিয়ে থাকে তার উপর মেঘ ক'রে আসায় যেন মনে হচ্ছিল সন্ধ্যা হয়ে গেছে। উপরের ঘরে অন্তরা কি একটা সুর বাজাচ্ছিল গীটারে সুপ্রিয় নিচের ঘরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে একটুখানি আকাশে মেঘের আনাগোনা লক্ষ্য করছিল অন্যমনস্কভাবে। মনটার ভিতরে তার অনেক কথা জমে উঠেছে। সাধারণত সে স্বল্প ভাষী, নিরীহ এবং শান্ত। কিন্তু আজ আঁধারে আলোকে জড়ানো দিনে তার মনের মধ্যে নানা প্রকার সুর উঠছিল। সে অস্থিরতা বোধ করছিল।

ওর মা এসে ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে দিলেন।

সুপ্রিয় বলল, 'মা, একটু বেড়িয়ে আসব ?'

শোভাময়ী বললেন, 'না, এখুনি ঝড় উঠবে।'

ঝড় কিন্তু উঠল না। আকাশ খানা ঘোর কালো হয়ে গিয়ে খানিকটা মেঘের গুরু গুরু গর্জন শোনা গেল তারপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে লাগল মেঘ গুলো। একটু একটু করে পরিষ্কার হতে লাগল আকাশ। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হচ্ছিল, সেটাও গেল থেমে। রোদ দেখা দিলো আকাশে। সুপ্রিয় ঘরের জানলাগুলো খুলে দিয়ে আলো নিবিয়ে

দিল। কিছুই ভাল লাগছিল না তার। চৌকির তলা থেকে ডুগি তবলা বার করে বাজাতে লাগলো আস্তে আস্তে। কতদিন বাজায়নি তবলা! আড়ষ্ট হয়ে গেছে যেন হাতটা। মনটিও নিবিষ্ট হচ্ছে না। কতদিন পূরবীর সঙ্গে দেখা নেই।

একা-একা নিজের মনেই সুপ্রিয় বাজিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মুখ তুলতেই দেখতে পেল দরজার কাছে স্বয়ং পূরবী দাঁড়িয়ে। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আরে, আরে, কখন এলে?'

পূরবী বলল, 'কি বাজাচ্ছিলে বলো তো? কি-রকম গোলমেলে লাগছিল ছন্দটা—'

সুপ্রিয় উঠে পড়ে তবলাটা এক পাশে সরিয়ে রেখে পূরবীর দিকে বাড়িয়ে দিল একখানা চেয়ার, 'এটা তোমার ত্রিতাল নয়, একটু গোলমেলে লাগবে বৈকি! কিন্তু, আসল গোলমালটা যেখানে সেটা ওই তবলার ছন্দে নয় আমার মনের গভীরে!'

'আহা রে, সেখানে আবার কী হল?'

'কী জানি-কে সেখানে বসে বাজায় সেতার আর এক হতভাগা প্রাণপণে ঠেলে তবলা।'

'বলো কী?' পূরবী চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'এ যে বিষম দশা!'

'হুঁ। খুবই সাংঘাতিক।

'কদিন ধরে লক্ষ্য করছি প্রাণের মধ্যে একটা জবর জলসা বসেছে। কেবল সেতার আর তবলা চলেছে সেখানে। কান পাতলে বুঝতে পারি, কোথায় একটু বেসুর উঠেছে, তবলাটা যেন ঠিক ভিড়ছ না সেতারের লয়ে। এতদিন আসোনি কেন?

'সুপ্রিয়দা, লয় ঠিকই আছে। অসুখে তোমার মন ঝিমিয়ে পড়েছে এই যা। তাই তোমার মনের বীণা থেকে সন্দেহের ঠোক আর ঝালা উঠছে। শোনো, আমি অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে নাম দিয়েছি। এক মাস সময় আছে। তোমাকে কিন্তু আমার সঙ্গে বাজাতে হবে।'

'তা বাজাব। সেদিন বিভাসবাবু কেমন বাজালেন, বলো শুনি।'

'বাবার কাছে খুব ভালো লেগেছে। জানো, উনি আবার সেতার বাজাতেও জানেন?'

'তাই নাকি?'

'আমাদের বাড়িতে তারপর কয়েকবার এসেছিলেন বিভাসবাবু, বাবার সঙ্গে সঙ্গীত নিয়ে বড়ো বড়ো আলোচনা করেন। আমি ওঁকে অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে থাকবার জন্যে অনুরোধ করেছি।'

'অর্থাৎ সেদিন তুমি সেতার বাজিয়ে ওকে তাক লাগিয়ে দেবে, তাই না?'

'ফার্স্ট প্রাইজ আমার চাই-ই—'

'বেশ কাল থেকে যাব তোমাদের বাড়ি।'

পূরবী বলল না আর কিছু। সে চলে যাবার পর সুপ্রিয় বসে বসে ভাবতে লাগল নানা কথা। হঠাৎ খানিকটা বাচালতা করে ফেলেছে সে,কিন্তু পূরবী সেদিক দিয়ে যায়নি। শুধু লয় ঠিক আছে— এইটুকু বলেই সে অন্য প্রসংগে চলে গেছে। ওর মাথায় এখন ঘুরছে অল্ বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশন। বেশ যাবে সুপ্রিয়, নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু মাঝখান থেকে বিভাসবাবু এসে পড়ল কেন? তার মনের ভিতরে যেন একটা ক্ষুব্ধ অভিমান পাক খেয়ে উঠল।

অন্তরা ঢুকল। ওর বোন।

'মণি চলে গেল নাকি, দাদা?'

'হ্যাঁ—'

'আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না তো?'

'ও যে কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ও নিজেই তা জানে না। আমাকে শুধু বাজাবার কথা বলে চলে গেল।'

অন্তরা তার পাশটিতে বসল, বলল, 'আবার কোথাও নাম দিয়েছে বুঝি?'

'অল্ বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে ও সেতার বাজিয়ে বিভাসবাবুকে দেখিয়ে দেবে সে কত বড়ো সেতারী।'

এই রকম বিষন্নভাবে, এমন আলগাভাবে সুপ্রিয় কখনো কথা বলে

না। ঈষৎ ঈর্ষা, তার সঙ্গে ক্লান্তির মিশেল। অন্তরা বিস্মিত হল। সে প্রসঙ্গটি পরিবর্তন করবার জন্যে বলল, 'আচ্ছা দাদা, মণির সেতার তোমার নিজের কেমন লাগে? আমার তো মনে হয় এখনো ওর অনেক বাকি। ওর বাজনা শুনে শুনে আমার মনে হয়, ওর মধ্যে একটা প্রচণ্ড অসংযম আছে। অসংযমকে জয় করতে না পারলে সঙ্গীত শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় সঙের গীত!'

সুপ্রিয় বলল, 'চারদিক থেকে প্রশংসা পেয়ে ওর মধ্যে একটা উদ্দামতা এসেছে, এ-কথা ঠিক। আজ যত জোরে সে ছুটছে এই ছোটা একদিন তার থামবে। এবং সেই দিনই বিপুল বিস্ময়ে সে হয়তো আবিষ্কার করবে এতকাল সে কেবল ছুটোছুটি করেছে, এক পা-ও এগোতে পারেনি! তখনই তার মধ্যে আসবে পরিবর্তন। এমন পরিবর্তন যে তুই-আমি সকলেই অবাক হয়ে যাব। আমার মনে হয়, এই পরিবর্তনের ধাক্কাটা আসবে বিভাস বাবুর কাছ থেকেই।'

'দাদা, তুমি বার বার বিভাস বাবুর নাম করছো। কে এই ভদ্র-লোক?'

'একজন সংগীত-পুরুষ।'

'সেটা আবার কি?'

'দেহ ও মনে যার সংগীত।'

'এমন মহাপুরুষটি কে দেখতে চাই। তুমি একদিন নেমতন্ন করো-না দাদা।'

'তুই সেদিন মণির জন্মদিনে গীটার বাজিয়েই চলে এসেছিলি, নইলে সেইদিনই ওকে দেখতে পেতিস। আবার ওকে দেখা যাবে অল্ বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশন্-এ। মণি ওকে নিমন্ত্রণ করেছে।'

'আমি যাব দাদা।'

'বেশ।'

বিঠলভাইকে সেইরাত্রে ধরাধরি করে উপরে তুলে আনা হয়েছিল। সিঁড়ির পাশেই দামিনীর ঘর, তার পাশের ঘরে থাকে সুরজিৎ সিং ও গঙ্গাধর। আর্তনাদটা প্রথমে শুনতে পায় দামিনী, সে সুরজিৎ সিংকে

ডেকে তোলে। গোলমাল শুনে গঙ্গাধরের ঘুম ভেঙে যায়। তিনজন বেরিয়ে এসে ছাখে গুলি-বেঁধা একটা জানোয়ারের মতো বিঠলভাই ছটফট করছে—তার সারা গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মহিষাসুরের মতো কালো চেহারাটা যেন যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠেছে। সুরজিৎ সিং ও গঙ্গাধর ওকে ওই অবস্থায় দেখে সহসা কী করবে কিছু ভেবে পেল না। উপরের ঘর থেকে ততক্ষণে নেমে এসেছে বিভাস ও লোপামুদ্রা। বুড়ো হামিদ হোসেন খাঁ-ও দাঁড়িয়ে গেছে সিঁড়ির মুখে। বিঠলভাইকে ধরাধরি করে উপরে তুলে আনবার সময় হামিদ হোসেন খাঁ তার রক্তাক্ত বীভৎস চেহারাখানার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। আতংকিতস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'এ কী হল বেটা?'

কেউ কোনো কথা বলল না।

বিঠলভাই যন্ত্রণায় কাতর ধ্বনি করছিল আর বলছিল, 'মুদ্রা-বহিন উসকো লৌট আনে বোলো, সরযূপ্রসাদ একটা পাক্কা শয়তান আছে। উসকো বিলকুল খারাপ কর্ দেগা—'

লোপামুদ্রা বলল, 'তুমি চুপ করো বিঠলভাই।'

কাঁধের উপর অপর হাতটি চেপে ধরে বিঠলভাই বলে, 'হম্ জরুর বদ্‌লা লেগা মুদ্রাবহিন, জরুর বদ্‌লা লেগা—'

হামিদ হোসেন ফের বলে, 'কী হয়েছে বেটা?'

লোপামুদ্রা বলে, 'চলো ওস্তাদজী তোমার ঘরে যাই—'

যেতে চাইল না হামিদ হোসেন, ঘাড় নাড়ল। বিঠলভাইকে তখন ধরাধরি করে ওর ঘরে এনে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। ওকে ঘিরে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোপামুদ্রা, দামিনী, সুরজিৎ সিং আর গঙ্গাধর। বিভাস তক্ষুনি চলে গিয়েছে ডাক্তার ডেকে আনতে। হামিদ হোসেন সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বলে উঠল, 'ভদ্রা বেটি কই?' ঘরের ভিতর আবহাওয়া থমথম করে উঠল। লোপামুদ্রা ওস্তাদজীর কাছে এসে দাঁড়াল। দামিনী মুখ তুলে কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। সুরজিৎ সিং-এর লম্বা দাড়ি বুকের উপর ঝুলে রইল, গঙ্গাধর মুখ নিচু করল। দশ বছর আগে একটা ভিখিরির মেয়েকে

সঙ্গে করে এনেছিল হামিদ হোসেন, নিজের মেয়ের মতোই তাকে ভালবাসত। কে তাকে বলবে একটা শয়তানের সঙ্গে আজ রাত্রে চুপিচুপি চলে গেছে সেই মেয়ে? আর, যাবার সময় এ বাড়ির বিশ্বস্ত প্রহরী বিঠলভাইয়ের কাঁধে বসিয়ে গেছে আমূল ছুরি? ঘরখানা থমথম করছিল। বিঠলভাই শুয়ে শুয়ে শ্বাস ফেলছিল। যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে সে-ই ফাঁস করল ব্যাপারটা। চুপ করে শুনল হামিদ হোসেন। শুনতে শুনতে তার মুখটা ব্যথায় করুণ হয়ে উঠল। কোনো কথা বলল না, বিশ্বস্ত প্রহরী বিঠলভাইয়ের চৌকির পাশটিতে বসে ক্ষতস্থানটি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল, বলল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে বিঠলভাই?'

বিঠলভাই বুড়ো ওস্তাদের মুখের পানে তাকিয়ে বলল, 'ওস্তাদজী, আমাকে ছোরা মেরেছে সরযূপ্রসাদ, ভদ্রা কিছু করেনি। আমার হাতে তখন কিছু ছিল না, আমি ওদের পায়ের শব্দ শুনে দৌড়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু আমি এর বদ্‌লা নেব ওস্তাদজী, বিঠলভাইকে জখম করে কেউ কখনো নিস্তার পায়নি। সরযূপ্রসাদকে আমি খুঁজে বার করবই—'

যন্ত্রণায় ও প্রতিহিংসায় ওর সারা মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। বিভাস ডাক্তারকে নিয়ে ঢুকল। ছোরা অনেক আগে উপড়ে ফেলেছিল বিঠলভাই। কাঁধের হাড়ের পাশ দিয়ে ছোরাটা এ-ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার সেটা ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন।

* * *

ভদ্রা নেই। বিঠলভাই জখমী হয়ে আছে। আসর সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। লোপামুদ্রা আর বিভাস হামিদ হোসেনকে নিয়ে ব্যস্ত। তারা দুজনেই বুঝেছিল ভদ্রার চলে যাওয়াটা হামিদ হোসেনের মনে আঘাত করেছে। কিন্তু বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না হামিদ হোসেনের, ঘটনার রাত্রে যেমন সহজভাবে শান্তমনে সে ঘটনাটি গ্রহণ করেছিল তারপরেও কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। পাছে আঘাত পেয়ে ভেঙে পড়ে সেই কারণে লোপামুদ্রা নিজের রেডিও-সেটটি এ-ঘরে এনে রেখেছে, তার সঙ্গে গ্রামোফোন আর কিছু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রেকর্ড।

হামিদ হোসেন ওর কাণ্ড দেখে হেসে বলেছিল, 'এ কী করছিস বেটি' তোর জন্যে কি রাখলি? না না নিয়ে যা—' লোপামুদ্রা বলেছিল, 'তোমার ঘরে থাকলেও যা আমার ঘরে থাকলেও তাই। আমি তো সব সময় তোমার ঘরেই আছি।'

বাস্তবিক সব সময়েই লোপামুদ্রা হামিদ হোসেনের ঘরেই থাকে। বুড়ো লোকটাকে প্রাণ দিয়ে সেবা করে। কিন্তু মাঝে মাঝে ফাঁকা আসরের ঘর থেকে বে-তালা চিৎকার ভেসে আসে, কে যেন দেয়ালে সোডার বোতল ছুঁড়ে ভাঙছে আর চিৎকার করে বলছে, 'কোই হ্যায়? ভদ্রাবাঈকো বোলাও, আব্ ভি বোলাও—'

হামিদ হোসেন বলত, 'বেটি যা, পুলকবাবু বোধহয় এসেছে—'

লোপামুদ্রা এসে দেখত পুলকবাবু বেসামাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাকে ঠেলে তুলে ঘর থেকে বার করে দিত সে। বলত, 'আর কক্ষনো আসবে না। ভদ্রাবাঈ এখানে নেই—'

টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নামত পুলকবাবু। ওর দিকে চেয়ে বলত, 'তুমি বুঢ্‌টী হয়ে গেছো, মুদ্রাবাঈ,—ভদ্রাবাঈকে আমার চাই-ই। ও-ভদ্রাবাঈ চলে গিয়ে থাকলে নয়া-ভদ্রাবাঈকে নিয়ে এসো।'

পুলক বাবু মাঝে মাঝে এসে এই রকম জ্বালাতন করত। আর কেউ আসত না বড়-একটা। লোপামুদ্রা আসরের ঘরটি বন্ধ করেই রেখেছিল সেই কারণে। পুলকবাবু তাই এ-মহলে না উঠে একেবারে ও-মহলে গিয়ে উঠত। বিভাসের ঘর পার হয়ে লোপামুদ্রার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় ধাক্কা দিত: 'এই বুঢ্‌টী দরজা খোল্—' বড়ো বেশি ধাক্কা দিত আর চেঁচাত পুলকবাবু। বিভাস বেরিয়ে আসত। ভাঙা হাতখানা চেপে ধরে বিঠলভাই বেরিয়ে আসত। বিঠলভাই বলত, 'এই পুলকবাবু চিল্লাচ্ছেন কেন?' পুলকবাবু টলত আর নেশায় ঘোর-ঘোর চোখ তুলে বলত, 'চেল্লাব না? আলবৎ চিল্লাব। ভদ্রাবাঈ নেই, শালা একদম নিরামীষ হয়ে গেছে বাড়িটা। আমি আজ বুঢ্‌টীকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি সে কোন নয়া বাঈকে আমদানি করতে পারে কিনা?'

লোপামুদ্রা ততক্ষণে দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে-মুখে তীব্র ঘৃণা। সে বলে, 'বিঠলভাই, বিভাস, জানোয়ারটাকে গেট পার করে দিয়ে এসো।'

পুলকবাবু বলে, 'আজ হম্ রহেগা তুমহারা ঘর মে। নেহি যাউংগা, কব্‌ভি নেহি।'—

বলে ঢুকতে যায় লোপামুদ্রার ঘরে। বাঁহাতে বিঠলভাই টেনে ধরে ওর একটা হাত। সেই হাতটাকে পিছুমোড়া করে নিয়ে ঠেলতে ঠেলতে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে গেট পার করে দিয়ে আসে। লোপামুদ্রা বলে, 'খবরদার ঢুকতে দিবি না ও-লোকটাকে। জানোয়ার, একটা আস্তো জানোয়ার।'

কিন্তু অতো সহজে নিস্তার পাওয়া গেল না পুলকবাবুর হাত থেকে। সে আবার আসে। বিঠলভাই জানতে পারলে ঠেকিয়ে রাখে না-হলে লোপামুদ্রার দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা পড়ে। বিরক্তি ও ঘৃণার শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল লোপামুদ্রা। সেদিন একটু বেশি রাত্রে বিভাস একা একা সেতার বাজাচ্ছে হঠাৎ দেখল পুলকবাবু একটি মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে দালান পার হয়ে লোপামুদ্রার ঘরের দিকে। পরক্ষণেই সেই অধৈর্য করাঘাত: 'এই বুঢ্‌টী, শিগগীর দরজা খোল্, এক নয়া ভদ্রাবাঈকে নিয়ে এসেছি—'

লোপামুদ্রা দরজা খুলে সামনে দাঁড়ায়। এদিক থেকে বিভাস আর ওদিক থেকে বিঠলভাই এল। বুড়ো হামিদ হোসেনকেও দেখা গেল ওদের মধ্যে। চেঁচামেচি শুনে সে-ও উঠে এসেছে।

কম বয়সী একটি সুন্দরী মেয়ে। ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। লোপামুদ্রা বলল, 'মেয়েটি কে? কোথা থেকে আনলে?

নেশায় টলছিল পুলকবাবু। বলল, 'কোথা থেকে আবার আনব। তোমাকে যেমন করে একদিন জমিদার বাড়ি থেকে ভুলিয়ে এনেছিলুম, ওকেও তেমনি ভাঁওতা দিয়ে আনলুম। ভদ্রাবাঈকে তো গড়ে-পিঠে মানুষ করে ছিলে, একেও এইবার মানুষ করো। দেখবে, দুদিনেই

ভদ্রাবাঈয়ের জায়গা দখল করেছে। বড় নিরামীষ হয়ে গেছে তোমার বাড়িটা বুঢ্‌টী—'

মেয়েটির সরল চোখ-মুখে এতক্ষণে গভীর আতংক ফুটে উঠল। সে লুটিয়ে পড়ল লোপামুদ্রার পায়ে, হু-হু করে কেঁদে বলল, 'দিদি, আপনি আমাকে বাঁচান। আমার বাবার বন্ধু উনি—সিনেমা দেখাবার নাম করে এখানে এনে তুলেছে। আপনার পায়ে পড়ি দিদি, আমার এ-সর্বনাশ করবেন না।'

লোপামুদ্রার চোখ-মুখ কঠিন হয়ে উঠল। বুড়ো হামিদ হোসেন বলল, 'ছিছি পুলকবাবু, একটা ভদ্দোর ঘরের মেয়েকে—'

পুলকবাবু বলল, 'তুমি চুপ করো বুড়ো। কে কত ভদ্দোর লোকের মেয়ে জানতে আমার বাকি নেই। প্রথম-প্রথম এই মানসী-ও ওই রকম করেছে, তারপর তো ওর কত রূপই দেখলুম! তাই না, মানসী? এ-পথে এসে কান্নাকাটি সব মেয়েই করে, দুদিন পরে পুরুষ মানুষ আর টাকার স্বাদ পেলেই মুখে হাসি ফোটে। বুঢ্‌টীর মতো তেজী মেয়েও শায়েস্তা হয়ে গেল—এ তো এক না খেতে পাওয়া হাভাতে ঘরের মেয়ে!

ঘৃণায় লোপামুদ্রার সারা মুখ একটু একটু করে কঠিন হয়ে উঠছিল। মনে মনে একটা সংকল্প ক'রে সে আশ্চর্য শান্তগলায় বলল, 'তাই তো! একেবারে টাটকা আমদানি—হয়তো কান্নাকাটি করবে। তারচেয়ে চলো গড়িয়াহাটায় আমার এক চেনা বাড়িউলির কাছে রেখে আসি—'

পুলকবাবু পুলকিত হল, 'বাঃ, খাসা! এই-না হলে আমার বুঢ্‌টীর বুদ্ধি! ঠিক হ্যায়, চলো।'

মেয়েটি আতংকে, ভয়ে, বিবর্ণ হয়ে অঝোর ধারায় কাঁদছিল। পুলকবাবু তার মুখে রুমাল বেঁধে পাঁজ কোলা করে তুলে নিচে নিয়ে চলল। লোপামুদ্রা নিজে গ্যারেজ থেকে মোটর বার করল এবং নিজেই ড্রাইভ করে পুলকবাবু ও মেয়েটিকে নিয়ে গেট পার হয়ে গেল।

কারো মুখে কোনো কথা ছিল না। হামিদ হোসেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বিভাসের চোখে একটা বোবা বিস্ময়। বিঠলভাইয়ের বাঁ হাতটা যেন পঙ্গুর মতো ঝুলে রইল। একমাত্র সে-ই কথা বলল,

'ওস্তাদজী মুদ্রাবহিন একী করল ? আমাকে একবার বললেই তো আমি শয়তানটার টুঁটি টিপে মেরে ফেলতাম।'

হামিদ হোসেন কোনো উত্তর দিল না। থমথম করতে লাগল দালানটা। তিনজনে কেউ কোনো কথা না বলে গভীর বিস্ময়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কতক্ষণ কেটে গেল কে জানে। মোটরের শব্দে সহসা চমকিত হল তারা। ঝাপসা চাঁদের আলোয় দেখতে পেল লোপামুদ্রার মোটর ফিরে আসছে। বিঠলভাই সোজা হয়ে দাঁড়াল, বিভাস ও হামিদ হোসেন চকিত হ'ল। রেলিঙের ধার থেকে উঁকি মেরে তারা দেখল, মোটর খানা গ্যারেজে তুলে লোপামুদ্রা উপরে উঠে এল—একা। বিভাস একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, 'মুদ্রাদিদি, মেয়েটিকে তাহলে গড়িহাটাতেই রেখে এলে ?'

লোপামুদ্রা বলল, 'না। মেয়েটিকে তাদের বাড়িতে রেখে এলাম।'

'সে কি! পুলকবাবু ?'

'সে এখন হাজতে। আমি সোজা ওদের থানায় নিয়ে গিয়ে তুলে ছিলাম। এ ছাড়া আমার অন্য কোনো উপায় ছিল না। ঠিক করিনি ?'

বিভাস চট করে তার পায়ের ধুলো নিল। বলল, 'দিদি, বাঁচালে। এতক্ষণ তোমার সম্বন্ধে যে কী খারাপ ধারণাই পোষণ করেছিলাম!'

হামিদ হোসেন বলল, 'বেটি, খোদা তোমার মঙ্গল করুক।'

অল্ বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে নামবার ইচ্ছা বিভাসের ছিল না। বাড়িটা একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। বরং, একটা চাপা থমথমে ভাব। লোপামুদ্রার মনের ভিতরকার চাপা আবর্ত কিছুই টের পাওয়া যায় না, তাকে আরো শান্তি ও সংযত দেখায়। হামিদ হোসেন চুপচাপ শুয়ে থাকে বিছানায়, কখনো কখনো উঠে হেঁটে বেড়ায়। বিঠলভাইয়ের ডানহাতের ঘা শুকিয়ে এসেছে, সে তবলাটা বাজাবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। বিভাস তাকে তবলা শোনায় আর হামিদ হোসেনকে সেতার। হামিদ হোসেনের ঘরেই তার সেতারের মহড়া চলে। আগের থেকে অনেকখানি সেরে উঠেছে হামিদ হোসেন। কিন্তু গলার ভিতরের ঘড়ঘড়ানিটা সম্পূর্ণ সারেনি। বিভাসের সেতার শুনতে শুনতে সে

নিজেই তবলা টেনে নেয়। বাজাতে থাকে বিভাসের সঙ্গে। আস্তে আস্তে বিঠলভাই এসে বসে, লোপামুদ্রাও এসে একপাশে বসে থাকে। বিভাসের বাজনা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

হামিদ হোসেন বলে, 'বেটা, তোমার বাজনা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। তুমি অল্ বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে নাম দাও ; দুমাস পরে দিল্লীতে অল্ ইণ্ডিয়া মিউজিক কম্পিটিশন হবে, সেখানেও নাম দেবে। এতদিন তোমাকে কি রকম শেখালুম সেটা একটু যাচিয়ে দেখা যাক—'

বিভাস নাম দিল অল্ বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে। সমস্যা ছিল তার সঙ্গে তবলা বাজাবে কে? হামিদ হোসেন বলল, 'বেটা তোমার বাজনা শোনাবার জন্যে তো আমাকে যেতেই হত, শুধু শুধু যাব কেন, আমিই তোমার সঙ্গে বাজাব তবলা—'

সুতরাং কম্পিটিশানের দিন হামিদ হোসেনকে সঙ্গে নিয়েই বিভাস উপস্থিত হল প্রাতযোগিতা ক্ষেত্রে। বিরাট একটা হল। লোকজন থৈ থৈ করছে। সামনে একটা মঞ্চের মতো করা হয়েছে আর হল-জুড়ে দর্শকদের আসন। আগের দিন উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের প্রতিযোগিতা ছিল, আজ যন্ত্র সঙ্গীতের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটির প্রতিযোগিতা। তার মধ্যেআছে সেতার সরোদ ও বেহালা। প্রত্যেকটি বিভাগে প্রতিযোগীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সামনের সারিতে বসে আছেন কোলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, তাঁরা বিচারক। উদ্যোক্তারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছেন প্রতিযোগিতা। চেঁচামেচি নেই হৈ চৈ নেই। মাইকে এক একজন প্রতিযোগীকে ডাকা হচ্ছে আর তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজিয়ে চলে যাচ্ছে।

বিভাস আর হামিদ হোসেন যেখানটায় বসেছিল তারই সামনের সারিতে বসেছিল পূরবী তার বান্ধবীদের নিয়ে। শীলা একবার মুখ ফিরিয়েই বোধহয় দেখতে পেল বিভাসকে, পূরবীর কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'এই, তোর সেই অসভ্যটা এসেছে।'

পূরবী বলল, 'কই?'

লীলা পিছন দিকে ইঙ্গিত করল। সে ঘাড় ফেরাতেই বিভাসের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। বিভাস যেন তার দিকেই চেয়েছিল নিমেষহত চোখে। কী আশ্চর্য রূপে সেজে এসেছে পূরবী। পরণে লাল টকটকে একখানি শাড়ি, তারসঙ্গে সম্বলপুরী কাজ করা ভেলভেটের ব্লাউজ। আভাঙ্গা খোঁপা ঘাড়ের উপর পড়েছে। পিছন থেকে বিভাস দেখছিল কানের বড় দুল দুটি ওর গালে যেন টোকা দিচ্ছে। তন্বী পূর্ণায়ত শরীরটি যেমন অতগুলো মেয়ের মধ্যেও স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল। চোখাচোখি হতেই বিভাস হাত তুলে নমস্কার করল। প্রতিনমস্কার করল পূরবী। ওদের সঙ্গে অস্তরা ছিল, তার পাশে সুপ্রিয়। অস্তরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করে সুপ্রিয়কে বলল, 'দাদা, ওই বুঝি তোমাদের বিভাস বাবু?' সুপ্রিয় বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু ওর হাতেও সেতার দেখছি, আজ একটা ভীষণ কাণ্ড হবে।'

পূরবী এবং সঙ্গিনীরাও ওর হাতে সেতার দেখেছিল। করবী বলল, 'মণি, আজ তোর বাজনা ভাল হওয়া চাই-ই।'

পূরবীর মুখে শুধু একটা দৃঢ়তার আভাস জাগল। পুরো একটি মাস ধরে সে দিনরাত পরিশ্রম করেছে আজকের দিনটির জন্যে। তার মনের মধ্যে অহমিকা যা ছিল তার জন্যে তার যতো না হোক, কেন বলা যায় না, বিভাসের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবার জন্যে তার পরিশ্রম এবং প্রস্তুতির যেন অন্ত ছিল না। সব সময় সে এই একটি রাগকে নানা-ভাবে ভেবেছে নানা ছন্দে বাজিয়েছে, লয়ের ভিতর কোথাও এতটুকু বিচ্যুতি রাখেনি। কথাপ্রসঙ্গে বিভাস একদিন বলেছিল, 'জানেন, ভারতীয় রাগ রাগিণীর মধ্যে লয়টা ততো বড়ো কথা নয় যতো বড়ো তার অন্তর্নিহিত সামগ্রিক রস রূপটি,—আলাপে বিস্তারে গতে তোড়ায় সেই রস রূপটি ফোটাতে না পারলে সঙ্গীতের মূল সত্যটি বাদ পড়ে যায়—'

পূরবী ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়েছিল। বলেছিল, 'আপনি দেখাতে পারেন বাজিয়ে?'

বিভাস কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিয়েছিল, 'আমি সবে শিখছি—'

সেই বিভাস একেবারে অল্ বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে এসে

উপস্থিত হয়েছে তার অনুরোধ রক্ষা করতে কিন্তু সঙ্গে এনেছে সেতার। কোলকাতার বিশিষ্ট গুণী সমাজের সম্মুখে সে তার বাজনা বাজিয়ে শোনাবে। পূরবীর মনে ছুটো বিস্ময় ঘা মারে। বিভাস হঠাৎ এভাবে এল কেন? আর, এলই যদি তাকে কেন আগে থেকে জানায়নি? একটু লজ্জিত হল পূরবী। কতোজনেই তো এসেছে? এই প্রতি-যোগিতায়, তারা কি সবাই তাকে জানিয়ে এসেছে মনটাকে সে আবার গুছিয়ে নিল।

মাইকে নাম ডাকা হয় পূরবীর, সে বাজাতে উঠে যায়। সাত মিনিট করে সময়, সুপ্রিয় তবলা নিয়ে বসল। পূরবী গোড়া থেকেই তবলার সঙ্গে বাজিয়ে তার বাজনা শেষ করল। বান্ধবীরা বলল, 'সত্যি চমৎকার বাজিয়েছিস্—'

বিভাসের নাম ডাকা হল তারপর হামিদ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে বিভাস গিয়ে বসল মঞ্চে। গুরুকে প্রণাম জানিয়ে সেতারটি কপালে ঠেকিয়ে সে বাজাতে লাগল। কয়েক সেকেণ্ড যেতে না যেতেই পূরবী সোজা হয়ে বসল। করবী কী একটা মন্তব্য করতে গেল পূরবী তাকে ধমক দিল, 'বাজে বকিস না—' বাস্তবিক প্রথমে দারুণ চমক তারপর ঘন বিস্ময়। একটু আগে সে যে-রাগ বাজিয়ে এসেছে বিভাস বাজাচ্ছে সেই রাগ। কিন্তু পটদীপের কী এই রূপ? এতো মিষ্ট, এত মধুর! এ জিনিস তো তার হাতে বাজেনি! অথচ এইটাই সে বাজাতে চেয়েছে বরাবর! সাতটি মিনিটের মধ্যে বিভাস যেন সাতটি স্বরের অপূর্ব রস-সমাবেশ ঘটাল। পূরবী প্রচণ্ড বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে।

বাজনা শেষ করে বিভাস যখন নেমে এল পূরবী মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে তাকে অভিনন্দন জানাতে গেল। কিন্তু তার আগেই অন্তরা গিয়ে দাঁড়িয়েছে বিভাসের কাছে। অন্তরা তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে অজস্র কথায়, বিগলিত ভংগি। সুপ্রিয় তাকে দেখতে পেয়ে ডাকল, 'এসো মণি, বিভাসবাবুর সেতার কেমন শুনলে?'

'এই হল সেতার।' অন্তরা বলল, 'অপূর্ব!'

পূরবী কোন কথা বলল না, শুধু তার মুখখানা টকটকে লাল হয়ে গেল। পর্য্যায় ক্রমে তিনজনের মুখের পানে তাকিয়ে বড়ো অশোভন ভাবে মুখ ঘুরিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে চলে গেল ওদের সামনে থেকে। মনে হল, কেউ যেন তাড়া করেছে। বাইরে ওর মোটর অপেক্ষা করছিলো, মোটরে উঠে পরক্ষণে পার হয়ে গেল কম্পিটিশন চত্বর। বান্ধবীরা অবাক, সুপ্রিয় অবাক, বিভাস অবাক।

শুধু অন্তরা বলল, 'দেমাক! দেমাক!'

* * *

তবু একদিন দেখা করতে গেল বিভাস। কিন্তু কী যে হয়েছে পূরবীর, ভালো ক'রে কথাই বলল না। খুব অপ্রতিভ হ'ল বিভাস। সে বলতে গেল, 'জানেন আপনার বাজনা খুব ভালো হয়েছে, আমার ওস্তাদজী বলছিলেন যদি একটু মন দিয়ে—' পূরবী এমন কড়াভাবে তার দিকে তাকাল যে বাকি কথাগুলি শেষ করতে পারল না। বিভাস অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। বলে, 'আপনি কি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না?'

'অনুগ্রহ ক'রে আমাকে একা থাকতে দিন।'

'বেশ। তবে একটা কথা বলি, আমি শিগগীর দিল্লী যাচ্ছি।'

'বেশ, যান।'

'কেন যাচ্ছি জিজ্ঞেস করলেন না?—সেখানে অল্ ইণ্ডিয়া মিউজিক কম্পিটিশনে নাম দিয়েছি, আপনি যাবেন?'

'ঠাট্টা করছেন?'

'ঠাট্টা?'

'আপনি একাই যান। আমি যাব না।'

ব'লে সে এমন কঠিন চোখে তাকায় যে বিভাস আর কোন কথা বলতে সাহস পায় না। ফিরে আসে।

হামিদ হোসেন বিভাসকে নিয়ে দিল্লী চলে যায়।

প্রতিযোগিতার পরদিন সকাল বেলা দীপক চা খেতে খেতে খবরের কাগজখানা পড়ছিল। খেলার পাতা শেষ ক'রে ভিতরের পাতা খুলেই সে চিৎকার করে উঠে, 'মণি, এই মণি, শিগগীর দেখে যা—'

তার চিৎকারে উপরের ঘর থেকে পূরবী আর রান্নাঘর থেকে মৈত্রেয়ী দেবী বেরিয়ে আসেন। পরাশরবাবুকেও দেখা যায় চুরুট টানতে টানতে নেমে আসছেন।

'কী হয়েছে দীপক ?' জিজ্ঞেস করলেন মৈত্রেয়ী দেবী।

'আমি বলিনি ছেলেটা জিনিয়াস ?—'উত্তেজিত ভাবে দীপক হড় বড় ক'রে অনেক কথা ব'লে যায়।

'কার কথা বলছো ?' জিজ্ঞেস করেন পরাশর বাবু।

'এই ছাখো বাবা—' দীপক বাড়িয়ে দেয় খবরের কাগজখানা। একটা ছবি বেরিয়েছে খবরের কাগজে, এক বৃদ্ধের সঙ্গে আলিংগনবদ্ধ হয়ে রয়েছে একটি তরুণ। তার নিচে ছোট এক টকরো সংবাদ, পরাশর বাবু পাঠ করলেন: "গতকাল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগীতায় কলিকাতার তরুণ সেতারী শ্রীবিভাস মুখোপাধ্যায় অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি ইতিপূর্বে নিখিল বঙ্গ সংগীত প্রতিযোগিতাতেও প্রথম হন। ইনি সোয়ামী ঘরাণার ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁ সাহেবের শিষ্য। এঁর বাজনায় সবিশেষ প্রীত হইয়া ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ তাঁহাকে আলিংগনবদ্ধ করেন।..."

মৈত্রেয়ী দেবী বলেন, 'আহা বড়ো ভালো ছেলে—.

দীপক বলল, 'শুধু ভালো ছেলে নয় মা, একেই বলে জিনিয়াস।'

পরাশর বাবু বললেন, 'মনি এর কাছে বাজনা শিখলে অনেক উপকার পাবে। শিখবি নাকি মণি ?'

কেউ লক্ষ্য করেনি পূরবী তখন খবরের কাগজখানা দলা পাকিয়ে দারুণ আক্রোশে মোচড় দিচ্ছে। তার চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে। দীপক বিস্মিত হয়ে বলে, 'কি হ'লরে মণি ?'

পূরবী কাগজখানা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, 'কিছু না।' বলেই তরতর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় উপরে। দীপক একবার পরাশর বাবুর দিকে আর একবার মৈত্রেয়ী দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাত উলটিয়ে বলল, 'বাঃ বাব্বা! এ যে একেবারে ক্লীন ব্রোল্ড্!'

বিভাস কোলকাতায় ফিরে আসতেই নানা মহল থেকে অভিনন্দন ও নিমন্ত্রণ পেতে লাগল। সকল জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। সে সাধ্যমতো অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দেয় এবং নিমন্ত্রণ রক্ষা করে। ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁকে সঙ্গে নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন মহল। তার পরিচিতি আরো বিস্তৃত হয়। লোপামুদ্রার বাড়িটা কিছুদিনের জন্যে বহু লোকের আনাগোনায় ভরপুর হ'য়ে ওঠে।

নব পরিচিত মহল থেকে আবেদন আসে ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করবার। বিভাস তাদের এড়িয়ে যায়। তখন কয়েকজন অত্যুৎসাহী গিয়ে ধরে হামিদ হোসেনকে। হামিদ হোসেন খানিক দ্বিধায় পড়ে। কেননা, ওকে আরো অধিক দূর অগ্রসর হবার জন্যে ওস্তাদ আফজল আলী খাঁর কাছে পাঠাবে কিনা। এই কথা বলেও সে সকলকে। তবু তারা পেতে চায় বিভাসকে। বলে, 'কাশীতে যাবার আগে পর্যন্ত বিভাস ছাত্রছাত্রী নিক।' আর আপত্তি করতে পারে না। বিভাস কতকগুলি টিউশ্যানি নেয়।

কিন্তু তবুও সে মনে মনে প্রত্যাশা করে পূরবীর কাছ থেকে চিঠি আসবেই কিংবা দেখা হ'য়ে যাবে কোনোখানে। ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সে বারে বারে উতলা হয়। কারণটা সঠিক সে বোঝে না। কিন্তু চিঠিও আসে না, দেখাও হয় না। ইতিমধ্যে সে কয়েকবার ঘুরে এসেছে ওদের বাড়ির সামনে থেকে, ভিতরে ঢুকবার সাহস পায়নি। পূরবী কেন যে তার পতি অপ্রসন্ন তা সে বুঝতে পারে না, এমন কোনো অপরাধের কথা তার স্মরণ হয় না। তাই সে অপেক্ষা করে' থাকে।

পূরবীর পরিবর্তে ডাক আসে অন্তরার কাছ হ'তে। দিল্লী জয়ের অভিনন্দন জানিয়ে তাকে একদিন নিমন্ত্রণ জানায় অন্তরা। সেই সঙ্গে আরো লেখে 'আসবেন, নিশ্চয়ই আসবেন। আপনার সেতার শোনবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছি।' প্রত্যুত্তরে বিভাস জানায়, সে আনন্দের সঙ্গেই তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছে। সেতার সহই সে যাবে, তবে বেশি লোকের ভিড় করবেন না। যাবার দিন ঠিক করে দেয় পরের সপ্তাহ, বুধবার।

অন্তরা ভিতরে ভিতরে যেন একটা পুলক বোধ করল। সুপ্রিয়কে সে জানাল বিভাসবাবু আসছেন, বুধবারে সে যেন অন্য কোথাও না যায়। নির্দিষ্ট দিনে নিচের ঘরটি পরিপাটি ক'রে সাজাল অন্তরা। নিজের হাতে ফর্দ রচনা ক'রে চাকরকে পাঠল বাজারে। মাকে বলল, 'আজ তোমার ছুটি।' বাবাকে বলল, 'আজ আমি এমন রাঁধব যে তোমার তাক লেগে যাবে।'—

ওর উৎসাহ ও আনন্দের বেগে সুপ্রিয় রইল গম্ভীর হ'য়ে। বিকেল বেলা আসার কথা বিভাসের, দুপুরে খেতে বসে সুপ্রিয় বলল, 'রান্না তোর খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু কাকে কাকে আসতে বলেছিস?'

অন্তরা বলল, 'উনি বেশী ভিড় বাড়াতে বারন করেছেন, আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে শুধু বলেছি। তুমি থাকবে, মা থাকবে বাবা থাকবে।'

'মণি আসবে?'

'ওই যাঃ, ওর কথা একেবারে ভুলে গেছি। দাঁড়াও, এক্ষুনি ফোন ক'রে দিচ্ছি।'

তখুনি উঠে ফোনে পূরবীকে ডাকল অন্তরা: 'হ্যালো মণি? হ্যাঁ শোন্ আজ বিকেল পাঁচটায় এক বিখ্যাত সেতারী আসছেন আমাদের বাড়িতে। ওই সময় সব প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে তোর কিন্তু আসা চাই, নইলে খুব রাগ করব। আসবি তো? আচ্ছা...'

অন্তরা যে ইচ্ছা ক'রে ওকে বলেনি তা নয়। অন্তরা জানে পূরবী বুধবারে ও রবিবারে বিকালের দিকে 'রাগিনী সম্প্রদায়ে' যায়। পূরবী নিজের হাতে এই ক্লাবটি গড়েছে। উদ্দেশ্য অতি মহৎ: সম্পূর্ণ মহিলা-দের দ্বারা পরিচালিত একটি সর্বাংগসুন্দর নাচ, গান ও বাজনার ইস্কুল গড়ে তোলা এবং এর মারফৎ দুঃস্থ মেয়েদের একটি মর্যাদাসম্পন্ন আয়ের পথ খুলে দেওয়া। ইতিমধ্যেই এই প্রস্তাব নিয়ে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এবং বডি মেম্বার্সরা উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। সর্বশেষে স্থিরীকৃত হয়েছে যে, প্রাথমিকভাবে লোকের মনে ইস্কুলটি সম্বন্ধে ভালো ধারণা গড়ে তুলতে হ'লে নাচ গান ও বাজনা প্রত্যেকটি বিভাগে উপযুক্ত

ব্যক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন। শিক্ষাদানের ব্যাপারে মহিলাশিল্পী পাওয়া না গেলে সেই সেই ক্ষেত্রে আপাতত পুরুষ শিল্পী নিয়োগ করা চলবে। তেমনভাবে নেওয়াও হয়েছে কয়েকজন পুরুষ শিক্ষককে। মহিলা পরিচালিত অর্কেষ্ট্রা পার্টির জন্যে পূরবী একজন দক্ষ সংগীত শিল্পীকে খুঁজছিল। পূরবী মনে ঠিক করে রেখেছিল একজনকে। সে বিভাস।

বিভাসের কথা ভাবতে ভাবতেই পূরবী এল অন্তরাদের বাড়ি। সে ভাবছিল, কতদিন হ'লে কোলকাতায় ফিরেছে বিভাস, তাদের বাড়ি একদিনও গেল না কেন? আহেতুক অভিমানে ওর মন ভ'রে উঠছিল। ওর সঙ্গে দেখা হ'লে ভালো হয়।

পূর্ব-আগত বান্ধবীদের নিয়ে অন্তরা দাঁড়িয়েছিল বাড়ির সামনেই, পূরবী বলল; 'কিরে দেরি করলাম নাকি?

'না। ঠিক সময়ে এসেছিস।

'কই তোর বিখ্যাত সেতারী কোথায়?'

'একটু অপেক্ষা কর্, দাদা আনতে গেছে।,

'কি নাম ভদ্রলোকের?,

'এলে চিনতে পারবি।'

'চিনতে পারব?'

'ওই যে আসছেন!'

দেখা গেল সেই সময় সুপ্রিয়র সঙ্গে মোটর থেকে নামছে বিভাস। সেই উজ্জ্বল চোখ, উলটানো এক-মাথা চুল, বুক-খোলা পাঞ্জাবী। পূরবী যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। বান্ধবীরা ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারা সেগুলি বিভাসের হাতে তুলে দিয়ে অভিনন্দন জানালো। তাদের অভিনন্দন গ্রহণ ক'রে পূরবীকে বলল, 'ভালো আছেন পূরবী দেবী? অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা। আ।—'

একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় পূরবীর সারা শরীর যেন মোচড় দয়ে উঠল। কতোদিনের পরে সাক্ষাৎ—কী প্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর! কিন্তু কা অসহ্য জ্বালা সারা মনে! তার ঠোঁট আবেগে বারেক থরথর করে ওঠে,

পরক্ষণে তীব্র চাপাস্বরে সে বলল, 'আপনি এখানে আসবেন তা আমি জানতাম না। দুঃখিত আমার অন্য কাজ আছে, আমি চললাম। নমস্কার!—'

সুপ্রিয় ডাকল, 'মণি—'

পূরবী তখন গেট পার হ'য়ে হনহন ক'রে চলে গেছে। অন্তরা বলল, 'দেমাক! বুঝলেন বিভাসবাবু, দেমাকে ওর মাথার ঠিক থাকে না!'

সুপ্রিয় বলল, 'আপনি আসুন বিভাসবাবু।'

বিভাস হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল। বলল, 'চলুন।'

* * *

...অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে পূরবীর দিন কাটছিল। তার মনের ভিতর একই সঙ্গে তীক্ষ্ণ জ্বালা ও তীব্র অনুতাপের সৃষ্টি হয়েছে। জ্বালা এই কারণে যে অন্তরা তার উপরে টেক্কা দিয়ে বিভাসকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে আর অনুতাপের কারণ হ'ল, যা সে বলতে চায়নি, যা সে বলতে পারে না, তা-ই সে বলে এসেছে বিভাসকে, সকলের সামনে। এতো অভদ্র অশালীন সে নয়, কিন্তু কী আশ্চর্য মানুষের মন!

কলেজ থেকে বাড়ি আসে পূরবী, বুধবারে ও রবিবারে 'রাগিনী-সম্প্রদায়ে' যায়। বাকি সময়টা বাড়িতেই চুপচাপ। সুপ্রিয় আসে সন্ধ্যার পর, কিন্তু পূরবী সেতারটা ছোঁয় না পর্যন্ত। সুপ্রিয় হয়তো বলে অভ্যেস না রাখলে এতোদিনের তৈরি হাত পড়ে' যাবে, পূরবী কোনো কথা বলে না; কেমন যেন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। সুপ্রিয় চমকে ওঠে। পূরবী তো এমনভাবে ভেঙে পড়েনি কখনো! কি হ'ল ওর? সে নতুনভাবে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করে কিন্তু পূরবীর কাছ থেকে পাওয়া যায় না কোনোপ্রকার সাড়া।

ইদানীং ওর অন্যমনস্কতা শুধু সেতার-বাদন ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়, সাজসজ্জাতেও ওর অবহেলা সকলের নজরে পড়ে। ওকে 'রিপন-বিউটি' বলে ডাকে. নিত্য নতুন শাড়ি ও স্টাইলে সব মেয়েকেই সে হার মানিয়েছে, কিন্তু আজকাল সেদিকে ওর সুস্পষ্ট উদাসীনতা। বান্ধবী-

মহলে ওকে নিয়ে আলোচনায় বিরাম নেই। সামনে একটা পরীক্ষা ছিল তাতে ওর ফল ভালো হ'ল না। ইরা, রঞ্জনা, অলকা, করবী, সকলে অবাক। কারণ লেখাপড়াতে কোনদিনই অমনোযোগী ছিল না। ইরা বলল, 'রাধার কী হৈল অন্তরে ব্যথা ? সদাই খেয়ানে চাহে মেঘ পানে, না ক'রে ক্লাসের পড়া...!'

পূরবী এ ঠাট্টার কোনো জবাব দেয় না, শুধু উঠে চলে যায়। পিছনে-পিছনে যায় করবী। নির্জনে একা পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'মুখপুড়ি, কী হয়েছে তোর ? প্রেমে-ট্রেমে পড়েছিস নাকি ?'

'প্রেম ?' ফের একটা ঝাঁকানি খায় পূরবী। ওর কাছ থেকে ও উঠে চলে যায় নিজের ঘরে। বন্ধ ক'রে দেয় দরজা। 'প্রেম ?' বুকের ভিতরে ধড়াস ধড়াস ক'রে ওঠে। কই, ব্যাপারটি তো সে এদিক দিয়ে কোনোদিন ভাবেনি ! বিস্ময়ে, আনন্দে, যন্ত্রণায় সে যেন কেমন হয়ে গেল এই তবে প্রেম ? রাগের সঙ্গে অনুরাগ, লয়ের সঙ্গে প্রলয়, সুরের সঙ্গে সঙ্গীত ! পূরবী অন্যমনস্ক হ'য়ে রইল সারাদিন। নিজেকে যেন আবিষ্কার করল নতুন ক'রে। তাতে যেমন বেদনা তেমনি আনন্দ।



আরো কিছুদিন পরে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পরাশরবাবু চুরুট সহযোগে চা পান করছিলেন,—পূরবী ঢুকল দ্বিধান্বিত পায়ে। অনাবশ্যক ভাবে সে খাটের চাদর একটু টেনে-টুনে দিল, মশারির চাল থেকে গুটানো অংশ নামিয়ে আবার চাপিয়ে দিল। জানলাটা আধ-ভেজানো ছিল সেটা পুরো খুলে আবার বন্ধ করল। এইভাবে এটা ওটা সেটা নাড়াচাড়া ক'রে খাটের বাজুর কাছে চুপ ক'রে দাঁড়াল।

হাই-পাওয়ার চশমার ফাঁক দিয়ে পিতা সবই লক্ষ্য করছিলেন এবার বললেন, 'কিছু বলবি ?'

কন্যা আঙুলে আঁচল জড়াতেই লাগল।

পরাশরবাবু পুনরায় চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর চা খাওয়া হয়েছে ?'

পূরবী ঘাড় নেড়ে জানাল, হয়েছে।

'ফেরবার সময় শাড়ি নিয়ে আসব ?'

'না।'

'মোটর চাই ?'

'না।'

'সেতার কিনে আনব নতুন একটা ?'

'উহুঁ।'

পরাশরবাবু হতাশ হয়ে বললেন, 'তবে খুলেই বল্-না বাপু কী চাই, আমাকে আবার এখুনি আপিসে বেরুতে হবে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা : 'বাবা, 'আমি—'

'বল্ ?'

'আমি—' আবার থেমে যায় পূরবী।

পরাশর বাবু বলেন, 'নাঃ, বসে বসে তুই ততক্ষণ খাবি খা আমি চট ক'রে মুখ-হাত ধুয়ে আসি।'

তিনি ফিরে এসে দেখলেন পূরবী ঘরে নেই। বিস্মিত হলেন একটু, পূরবী এমন তো কখনো করে না। কিন্তু সময় ছিল না মোটে, তাড়তাড়ি পোষাক বদলে আপিসে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বান্ধবীদের কাছেও এই ধরনের কী-একটা কথা বলতে গিয়ে ঢোঁক গিলতে লাগল পূরবী। তার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে অকারণ আনন্দের রং, কিন্তু পাশাপাশি জেগে থাকে বেদনার স্বচ্ছ প্রকাশ। কাউকে কিছু বলতে পারে না, মাঝখান থেকে সে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। বিভাসের ঠিকানা, খুঁজছে সে, নিজের সব অহংকারকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে সে বিভাসের কাছে যেতে চায়। কিন্তু কার কাছ থেকে মুখ ফুটে চাইবে বিভাসের ঠিকানা ? অন্তরা জানে, সুপ্রিয় জানে, বাবা জানে, হয়তো দাদাও জানে ? কিন্তু কী করে তাদের কাছে চাওয়া যায় ঠিকানা ? কী ভাববে ওরা ? কী মনে করবে ? পূরবী যেন এই একটিমাত্র জিজ্ঞাসার অগ্নিচক্রে নিজের হৃদয়টাকে পোড়াতে থাকে। বান্ধবীরা লক্ষণ ভালো বুঝল না। প্রিয় বান্ধবী করবী জিজ্ঞেস করে, 'ভাই মণি, কি হয়েছে তোর খুলে বল্। দিন দিন কী রকম যেন শুকিয়ে যাচ্ছিস তুই।'

পূরবী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, বলে, 'কী হবে। কিছু না।'

সে ধরা পড়ে খেলোয়াড়-দাদা দীপকের চোখেও। দীপক বলে, 'কী হয়েছে বোনটি আমার ?'

পূরবী বলে, 'কিচ্ছু হয়নি দাদা।'

মা'র চোখ কোনদিনই এড়ায়নি, তিনি আরো স্নেহার্দ্র কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, 'আমার কাছে লুকোসনি মণি, কী হয়েছে তোর আমাকে খুলে বল্।'

থালার খাবার নাড়াচাড়া করে পূরবী, জোর ক'রে মুখ তুলে বলে, 'আমার কিছু হয়নি মা—'

তারপর ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে কেঁদে ফ্যালে।

অনেক রাত্রে ফেরেন পরাশরবাবু। দুপুরে কোনদিন খেতে আসেন কোনদিন আসেন না। সব কাজকর্ম চুকিয়ে অনেক রাত্রে যখন তিনি বাড়ি ফেরেন তখন অধিকাংশ দিন ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ে, শুধু জেগে থাকেন একা মৈত্রেয়ী দেবী। পরাশরবাবু নিঃশব্দে মোটর গাড়িখানা ভিতরে ঢুকিয়ে গাড়ি-বারাণ্ডায় এনে ইলেকট্রিক হর্ণ-এ ছোট্ট একটি আওয়াজ তোলেন: টিক্। সেইটাই হ'ল সংকেত। একদিক দিয়ে চাকর অপরদিক দিয়ে মৈত্রেয়ী দেবী বেরিয়ে আসেন। পরাশরবাবুকে ঢাকা খুলে খেতে দেন মৈত্রেয়ী দেবী, বসে থাকেন পাশটিতে। এ তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস। পরাশরবাবু তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে হাসেন আর বলেন, 'ঘুমে ঢুলছো নাকি, যাও শুয়ে পড়ো গে—'

লজ্জিত হ'য়ে ফের সোজা হয়ে বসেন মৈত্রেয়ী দেবী। পরাশরবাবু বললেন, 'আমার আর কিছু লাগবে না, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়গে বরং।'

মৈত্রেয়ী দেবী বসে থাকেন। মৃদুকণ্ঠে বলেন, 'তুমি খেয়ে নাও আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না সেই কোন্ ছেলেবেলাকার অভ্যাস!'

পরাশর বাবুও হাসেন। কিন্তু এতো রাত্রে ফিরে তিনি সবদিনই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েন না। অন্ধকারে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে আস্তে আস্তে শয্যা হ'তে নামেন স্ত্রীর খাটের কাছে গিয়ে একটুখানি

দাঁড়ান, লক্ষ্য করেন মৈত্রেয়ী দেবী ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা, দেওয়ালের গাত্র থেকে পেড়ে নেন্ কেশসুদ্ধ বেহালাটি। সন্তর্পনে পা টিপে টিপে খোলেন দরজা। কিন্তু এতো সাবধানতা সত্ত্বেও পিছন হতে আচমকা শুনতে পান মৈত্রেয়ী দেবীর গলা : 'বেশি রাত কোরো না কিন্তু!'

পরাশরবাবু অপ্রস্তুত হ'য়ে বলেন, 'হেঁ—সেই কোন্ ছেলেবেলাকার অভ্যাস! তুমি তো জানো।'

দরজা ভেজিয়ে তিনি চলে আসেন সম্মুখের খোলা বারাণ্ডায়। আর্মড্ চেয়ারখানা ঘুরিয়ে বসে পড়েন তাতে। রেলিঙের ধার ঘেঁসে অতলান্ত অন্ধকার। চারদিক কী নিঃসীম নির্জন। মধ্যরাত্রির কোলকাতার আকাশ-মাটি ব্যেপে যেন থরথর করছে স্তব্ধতার সুর। পরাশরবাবু নিজের মধ্যেই যেন স্তব্ধ হ'য়ে যান, আবেগ বোধ করেন। অন্ধকারের দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে থেকে তিনি তুলে নেন বেহালা খানি—আলাপ সুরু করেন নন্দকৌশে। অনেকক্ষণ বাজান। এক সময় বুঝতে পারেন অন্ধকারে তাঁর পায়ের কাছে কে যেন এসে বসল। বেহালা থামিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তুই কেন উঠে এলি, মা?'

পূরবী বলে, 'বাবা, আমি এমনি করে রাগ বাজাতে চাই। তুমি আমাকে এই সুরের দীক্ষা দাও—'

করুণ ও কোমল শোনায় তার গলার স্বর। যেন এইটাই তার একমাত্র কামনা। বেশ বিচলিত বোধ করেন পরাশর বাবু। কন্যার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বলেন, 'মা' আমি তো বেশি শিখিনি তুই বিভাসের কাছে যা, সে তোকে দিতে পারে তুই যা চাইছিস।'

পূরবী আবার ঘা খায়। বিভাস! বিভাস!

সুপ্রিয় নিয়মিত আসে, আর চলে যায়। পূরবীর ভাব-পরিবর্তন সে লক্ষ্য করেছে কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না—বেদনায় তার বুকের ভিতরটাও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। বুঝতে পারে পূরবীর মনের ভিতরে একটা কিছু ঘটেছে কিন্তু সেটা যে কী সে ধরতে পারে না। সেতার বাজাতে চায় না পূরবী, সর্বদাই অন্যমনস্ক নয়, কিসের যেন

প্রতীক্ষা। সে কী যেন খুঁজছে। সুপ্রিয়র প্রতি তার আগ্রহ যেন কমে গেছে, সে এলে খুশিও হয় না বিরক্তও হয় না। সুপ্রিয় বুঝতে পারে না, কোথা দিয়ে কেমন করে এই পরিবর্ত্তন এল। সে সন্ধ্যার পর আসে আর চলে যায়।

কিন্তু পূরবীকে এমন নিষ্ক্রিয় বিষন্ন মূর্তিতে দেখতে তার মন চায় না। পূরবী সেতার বাজাতে ভালোবাসে, তাই সে বার বার সেতার তুলে দেয় তার হাতে। বলে, 'মণি, চলো, আমার এক বন্ধু ঘরোয়া-জলসার আয়োজন করেছে, তুমি সেখানে সেতার বাজাবে।'

পূরবী বলে, 'না সুপ্রিয়দা, সেতার আমি বাজাব না।'

'কিন্তু সেতার না বাজিয়ে-বাজিয়ে তোমার হাত যে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।'

'তাই হোক সুপ্রিয়দা। নতুন ক'রে শিখতে গেলে নতুন হাতই দরকার।'

'নতুন ক'রে শিখবে তুমি ?'

'হ্যাঁ।'

'কার কাছে শিখবে ?'

'তাকেই যে খুঁজে পাচ্ছি না।'

সুপ্রিয় ওর সব কথা বোঝে না। তবু সে আসে আর চলে যায়।

* * *

এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে যায় বিভাসের ঠিকানা। সেটা প্রাক-শীতের সকাল। ভোরের দিকে বেশ একটু আমেজ-লাগা ঠাণ্ডা থাকে। সকালবেলা শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠতে সকলেরই কেমন আলস্য বোধ হয়। শুধু চিরভ্যাস মতো প্রত্যুষে ওঠেন মৈত্রেয়ী দেবী। বাসি-পাটের কাজ সেরে স্বামী ও ছেলেমেয়েদের জন্যে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসেন। এক এক ক'রে সকলের ঘরে চা পাঠিয়ে দেন।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে দীপক চায়ের কাপটি নেয়, সংসারে মায়ের প্রয়োজন যে কতোখানি এই সত্য আমি নতুন করে প্রচার করব।'

মৈত্রেয়ী দেবী হেসে ফেলে বলেন, 'থাক্ খুব হয়েছে। আর চিনি লাগবে কিনা বল্ ?'

দীপক চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, 'নো। মেনি মেনি থ্যাংকস্।'

পাশের ঘরে পূরবী আড়মোড়া ভেঙে শয্যায় উঠে বসে। বলে, 'মা, রেডিওটা চালিয়ে দিয়ে যাও। চায়ের সঙ্গে রেডিও-র গান না হলে জমে না।'

পরাশরবাবু থাকেন ওপাশের ঘরে। তিনি স্ত্রীর হাত থেকে চায়ের কাপটি নিয়ে বলেন, 'নিরু, যদি কিছু মনে না করো আমার চুরুটের বাক্সটা বাড়িয়ে দাও। চায়ের সঙ্গে চুরুট না হলে ঠিক জুত হয় না।'

মৈত্রেয়ী দেবী প্রতিদিন এইভাবে চা দিয়ে যান আর ছেলে-মেয়ে-স্বামীর ছেলেমানুষী দেখেন। রাগ করেন না তিনি, বরং মনে মনে খুশিই হন্।

সেদিনও সকালবেলা শয্যায় বসে চা খাচ্ছিল পূরবী আর শুনছিল রেডিও। রবীন্দ্র সংগীত হ'য়ে গেল পর পর দু'খানা। ঘোষক ঘোষণা করলেন, 'এবার যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠান। সেতার, রাগ জৌনপুরী। বাজাচ্ছেন শিল্পী বিভাস মুখোপাধ্যায়—'

হাতের উপরেই চা-টা যেন চল্‌কে পড়ল। চমকে সোজা হ'য়ে বসল পূরবী। তাড়াতাড়ি বেতার জগতের পাতা উলটিয়ে দেখল আধঘণ্টার প্রোগ্রাম, শিল্পীর কোনো নাম নেই, শুধু 'সেতার'। এক মিনিট কী ভাবল পূরবী। তারপর তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে সাজগোছ ক'রে নিল। পরাশরবাবুর ঘরে উঁকি মেরে দেখল বাবা খবরের কাগজ মেলে ধরেছেন, ধোঁয়া উঠছে মাথার কাছ হ'তে। বুঝতে পারল, বেরুতে দেরি আছে। কোনো কথা না বলে পূরবী তর্‌তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, গ্যারেজ থেকে মোটর খানা বার করে বেরিয়ে গেল পরক্ষণে।

একটু আগেই সে এসে পড়েছিল।

প্রোগ্রাম শেষ করে বিভাস বেরিয়ে আসছিল, মোটরের ভিতর থেকে পূরবী ডাকে, 'বিভাসবাবু।

এদিক-ওদিক তাকায় বিভাস, কাছে এসে বলে, 'আরে, আপনি? কী খবর?

আসুন মোটরে। সে মোটরের দরজা খুলে দেয়।

'পথ থেকে রথে তুলছেন ভয়ে উঠব, না নির্ভয়ে?

'নির্ভয়ে।

বিভাস ভিতরে উঠে বসল।

'এবার যাত্রা কোন্‌দিকে?

'আপনার তাড়া আছে?

'কিছুমাত্র না৷

'একটা কথা বলব?

'স্বচ্ছন্দে।

সকালবেলা আপনি কি করেন?

'সেতার বাজাই। কি রাগ জানেন? পূরবী।

পূরবীর মুখখানা টকটকে লাল হ'য়ে গেল।

'মিথ্যুক।'

'এর চেয়ে সত্যি আর কিছু হতে পারে না।

'আমার কথাটা এখনো বলা হয়নি।

'বলুন।

আমি আপনার কাছে সেতার শিখব।

তাহলে চলুন আমার ওস্তাদজীর কাছে। তার সম্মতি পেলেই আপনার গুরুগিরি করতে পারি।

তিনি বুঝি খুব কড়া লোক।

তাঁর মতো লোক হয় না।

কি দক্ষিণা নেবেন?

সেটা এখন বলব না।

অসভ্য!

বিভাসের নির্দেশ মতো পূরবীর মোটর এসে দাঁড়ায় লোপামুদ্রার বাড়ির সামনে। দুজন নামে। বিঠলভাই বাগানে কাজ করছিল ওদের

দিকে একটুখানি তাকায়। বিভাস উপরে উঠে লোপামুদ্রার সঙ্গে পূরবীর পরিচয় করিয়ে দেয়, তারপর চলে হামিদ হোসেনের কাছে। হামিদ হোসেন তখন সারেংগীতে সুর ছাড়ছিল ওদের দেখতে পেয়ে অভ্যর্থনা করে। বিভাস বলে পূরবীর কথা। হামিদ হোসেন কিন্তু বিশেষ খুশি হয় না বলে বেটা তুমি দিনদিন বড়ো জড়িয়ে পড়ছো এরকম করলে সংগীত-সাধক হওয়া যায় না। দেখতে পায় পূরবীর মুখখানা ম্লান হয়ে গেছে। বলে, না বেটি তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না, বিভাস তোমাকে সেতার শেখাবে। টিউশ্যানি যখন নিয়েছে তখন ভালো করেই টিউশ্যানি করুক। কিন্তু ওকে আরো অনেক বড় হতে হবে। আমি সেই আশায় আছি।

ওস্তাদজীর ঘর হতে বেরিয়ে ওরা আবার মোটরে ওঠে। বিভাস বলে জানো পূরবী ওস্তাদজীর কেবল ভয় আমি কারো প্রেমে পড়ে সংগীতের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হব। ঘর-পোড়া গুরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়। ওস্তাদজী প্রেমে ব্যর্থ হয়েছেন।

পূরবী বলে তুমি কবে থেকে আসছো ?

বিভাস ওর একখানা হাত তুলে নেয়। বলে এখুনি যেতে ইচ্ছা করে।

'কাল থেকে এসো।'

'আচ্ছা।'

বিঠলভাই বাগানে মালীর কাজই নিয়েছিল। পূর্বেকার মালী অদ্বৈত বুড়ো হ'য়ে কাজে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি চলে যাওয়ায় লোপামুদ্রাকে ব'লে এই কাজটাই নিয়েছিল বিঠলভাই। সকালে-সন্ধ্যায় ফুল-গাছের গোড়ায় সে জল দেয়, জখমী গাছগুলোকে সযত্নে সেবা করে। তার দিকে বিভাস তাকায়, আর দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নেয়। সে নিজেও তুঙ্গভদ্রাকে ভুলতে পারে না, পায়রার মতো উঁচু বুক আর নাচের মতো সুঠাম শরীর—একদিন তাকে অন্ধকার ঘরে পিষে ধরেছিল। অক্টোপাসের মতো বাহুর বাঁধন এখনো তার শরীরে জড়িয়ে রয়েছে—সে-স্মৃতি সহজে ভোলা যায় না। বাগানে কর্মরত বিঠলভাইয়ের পানে তাকিয়ে বিভাস শুধু একটি ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নেয় আর হতভাগ্য লোকটির কথা ভাবে। অন্য কেউ না জানুক বিভাস জানে, ওই দৈত্যের মতো বিশালকায় লোকটি তুঙ্গভদ্রাকে কতখানি ভালোবাসত।

কাঁধের জখম সেরে গেছে বিঠলভাইয়ের! কিন্তু সেই সঙ্গে জোর কমে গেছে অনেকখানি। ডানহাতটা পুরোপুরি বিকল হ'য়ে থাকে। তবলা বাজাবার চেষ্টা ক'রেও আগেকার মতো সচ্ছন্দ হ'তে পারে না বিঠলভাই। সেই জোর নেই। তবলা সে আর বাজায় না, কিন্তু তার রক্তের মধ্যে নিয়তই একটা লহরা বেজে চলে। সেই লহরাটি হল: বদ্‌লা লুংগা,—বদ্‌লা লুংগা,—বদ্‌লা লুংগা—

বদ্‌লা নেবে বিঠলভাই—দারুণ নেবে। তাকে জখম ক'রে কেউ কখনো নিস্তার পায়নি, পাল্‌টা জবাব সে দেবেই। ফুলগাছের গোড়ায় জল দেওয়ার কাজ শেষ হ'য়ে গেলেই তার শুরু হয় শহর-পরিক্রমা। এ-গলি, ও-গলি, এ-পাড়া, ও-পাড়া, বড়ো বড়ো রাস্তা, লেন-বাইলেন। সমস্ত শহরটা চষে বেড়ায় বিঠলভাই। কোমরে গুঁজে রাখে ফলা-মোড়া দীর্ঘ একটা ছোরা। যেখানেই দেখা হোক, পুলিশ ফাঁড়ি কিংবা অন্ধকার রাস্তা, লোকের ভিড়ে কিংবা নির্জনতায়,

সে তার সদ্ব্যবহার করবেই। রক্তের মধ্যে তার উন্মাদ লহরা বাজে, বদ্‌লা লুংগা—বদ্‌লা লুংগা—বদ্‌লা লুংগা। কতোদিন পালিয়ে বেড়াবে সরযূপ্রসাদ ? বেঁচে থাকলে একদিন তার সঙ্গে দেখা হবেই।

ভয়ংকর প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মতো বিঠলভাই সারা কোলকাতা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। চোখে সতর্ক দৃষ্টি। থপ থপ ক'রে পা ফ্যালে আর বাঁহাত দিয়ে চেপে ধরে ছোরার বাঁট। পাথরের মতো শক্ত হ'য়ে ওঠে চোয়াল, ইঁটের মতো কঠিন হয় হাতের পেশী। দাঁতের উপরে জাগে প্রবল ঘর্ষণ আর ঠোঁটে চাপা হিস্‌হিস্ বিড়বিড়ানি : 'বদ্‌লা লুংগা, বদ্‌লা লুংগা, বদ্‌লা লুংগা—'

বিঠলভাই বদ্‌লা নেবে।

জমাট শীতের রাত্রি। বরফের মতো ঠাণ্ডা কোলকাতা। ট্রামলাইন থেকে অনেক দূরে ছোটো সরু একটা কানাগলি। টিমটিম করছে গ্যাসের বাতি—লোকজন নেই। দুপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়া বাড়ি, মাথার উপরে শীসের মতো কালো স্তব্ধ আকাশ। বিঠলভাই একা দাঁড়িয়ে ছিল সেই গলির মুখে—ধ্বক ধ্বক ক'রে জ্বলছে তার হিংস্র চোখ দুটো।

সে এতক্ষণ ধরে নিঃশব্দে অনুসরণ করে এসেছে একটি লোককে—রোগা, পাতলা একটি লোক, ভীরু-ভীরু চাহনি, এমন ভীরু যে বিঠলভাইকে দেখেই ঢুকে পড়েছে এই গলিতে। যেন চমকে গেছে লোকটা। অন্ধকারে দৌড়ে এসেও তাকে ধরতে পারেনি বিঠলভাই। 'শালা হারামীর বাচ্ছা—' গালি দিয়েছে সে, চাপা আক্রোশে কামড়ে ধরেছে নিচের ঠোঁট : 'শালা বেরিয়ে আসতে হবে তোকে, দেখি আজ আমার হাত থেকে কে তোকে রক্ষা করে।' হিংস্র আক্রশে সে বাঁট হ'তে ছোরা খানা তুলেছে আর ঢুকিয়েছে।

ঠিক একটা রক্ত পিপাসু জানোয়ারের মতো বিঠলভাই গলির মুখে অপেক্ষা করছিল।

লোকটি কিন্তু খানিক পরেই বেরিয়ে আসে। দূর হতে সে বিঠলভাইকে লক্ষ্য করে। 'শালা, ভেবে ছিলুম সেই হারামী

কাবলিওয়ালা।' কাছে এসে লোকটি রুখে দাঁড়ায়, 'এই, এই উল্লুক, তুমি তখন আমাকে তাড়া করেছিলে কেন? বেটা বদমাইস—'

বিস্ময়ে ডুবে যায় বিঠলভাই। হুবহু সরযূপ্রসাদ। কিন্তু গ্যাসের আলোয় স্পষ্ট বোঝা যায় লোকটি সরযূপ্রসাদ নয়। লজ্জিত হয় সে। মাফ চেয়ে নিয়ে বলে, বাবুজি কসুর হো গ্যয়া, মাফ কিজিয়ে।'

লোকটি বক বক করতে করতে চলে যায়।

এই রকম আরো দু'তিনবার হয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে ঠিকমতো মানুষ চেনা যায় না। কিন্তু কতোদিন লুকিয়ে থাকবে সরযূপ্রসাদ? এইভাবে একদিন-না একদিন ঠিক তাকে ধরবে বিঠলভাই। আর, তুঙ্গভদ্রা? তার সঙ্গে কি একদিনও দেখা হবে না? সরযূপ্রসাদ তার হাত জখম করেছে আর ওই নাচওয়ালী মেয়েটা জখম করেছে তার দিল্। বদলা নিতে যখন বেরিয়েছে বিঠলভাই তখন দুটোরই বদলা সে নেবে— যাকেই সে আগে পাবে। বিঠলভাই ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়ে নতুন করে শপথ শানিয়ে নেয়। এমন সময় ডাষ্টবিনের পাশ থেকে উঠে আসে ভিখারিণীটি। ধুঁকতে ধুঁকতে ভিখারিণী বলে, 'মেহের বাণী ক'রে দুটো পয়সা দিয়ে যাও। বহুত কড়া বিমার। দো রোজ সে ভুখ্ মে মরতা হুঁ।

অন্ধকারে কেউ কাউকে চিনতে পারেনি। বিঠলভাই পকেট থেকে দুটো পয়সা বার করে তার হাতে দিতে যাচ্ছিল, মুখের দিকে তাকিয়ে ভাষণ ভাবে চমকে উঠল।

কে? কে তুমি?'

ওকে টেনে নিয়ে আসে লাইট পোষ্টের নিচে।

'এ কি! এ কি হাল হয়েছে?—ভদ্রা!'

তুঙ্গভদ্রা টলে পড়ে যায়, বিঠলভাই তাকে ধরে ফ্যালে।

* * *

তুঙ্গভদ্রাকে বাড়িতে এনে তুলল বিঠলভাই। নিজের ঘরে এনে আলো জ্বেলে, আর-এক দফা চমকে গেল সে। কী কুৎসিত হয়েছে তুঙ্গভদ্রা। ঘরের মেঝেতে বসে ধুঁকছিল সে, বিঠলভাই তাড়াতাড়ি তার গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে দিল।

'নসীব। আমার নসীব।' তুঙ্গভদ্রা বলে।

'হারামী। শালা হারামীর বাচ্ছা।' বিঠলভাই বিড়বিড় করে।

তুঙ্গভদ্রা বসে থাকতে পারে না, মেঝের উপরেই শুয়ে পড়ে। ঘরের আলো স্পষ্টভাবে শরীরের উপরে পড়ল। বাস্তবিক তাকানো যায় না। সারা মুখে দগ দগ করা বড়ো বড়ো ঘা। মাথার চুল সব উঠে গেছে। চোখ দুটি ঢুকে গেছে একেবারে গর্তে, চোয়াল ঠেলে উঠেছে, গায়ের চামড়া শুধু হাড়ে জড়ানো। পায়রার মতো উঁচু বুক চুপসে পাত হয়ে গেছে, ধুক ধুক করছে গলার কণ্ঠী, কাঠির মতো সরু সরু পা ও হাত। মানুষ নয়, যেন চর্মাবৃত কংকাল। ভাবাই যায় না, এই মেয়ে একদিন হাত নেচে নেচে সকলের মাথা ক'রে দিয়েছিল।

একটু পরে মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়ল তুঙ্গভদ্রা, বিঠলভাই ডেকে আনল সবাইকে। বুড়ো হামিদ হোসেন এল, লোপামুদ্রা, বিভাস এল। ঘুমন্ত তুঙ্গভদ্রার মুখের পানে তাকিয়ে সকলেরই মন বেদনায় ভরে গেল। হামিদ হোসেন উপর দিকে চেয়ে বলল, 'খোদা মেহেরবান! কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল, পরে বলল, 'বিঠল-বেটা এ তো খুব খারাপ বিমার। বড়ো সংক্রামক।'

বিঠলভাই বলল, 'হাঁ ওস্তাদজী। ওকে এখানে রাখা চলে না। কাল সকালেই আমি ওকে নিয়ে যাব।'

'কোথায়'

'আমার দেশে। আমি ওকে সারিয়ে তুলব ওস্তাদজী, আবার ওর পায়ে নাচ আনব।'

'কিন্তু ও কি সারবে বিঠলভাই?

'জরুর সারবে ওস্তাদজী, আমি ওকে সারিয়ে তুলব। ওকে সারাতে না পারলে আমার বদ্‌লা নেওয়া যে হবে না।'

হামিদ হোসেন নিজের মনে ফের বলে, 'খোদা মেহেরবান!'

পরদিন সকালে বিভাস চুপ ক'রে দাঁড়ায়েছিল রেলিঙের ধারে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে ছাখে ডান কাঁধে কম্বল জড়ানো অসুস্থ তুঙ্গভদ্রাকে চাপিয়ে বিঠলভাই আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে।

স্কন্দে গেরিলার মতো দশাসই লোকটা এমন সন্তর্পনে সিঁড়ি ভেঙে নামছে যে একটু নড়ে গেলেই যেন তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিভাস ডাকে, 'বিঠলদা—'

কম্বল ঢাকা মানুষটিকে সাবধানে একহাতে চেপে মুখ তোলে বিঠলভাই বলে, 'বিভাস ভাই' পিছু ডেকো না। আমি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'আমার দেশ। গুজরাট।'

'ওকে সারাতে পারবে?'

'জরুর।'

এ যেন অন্য বিঠলভাই। কী দৃঢ় ওর কণ্ঠস্বর।

সাবধানে পা ফেলে তুঙ্গভদ্রাকে নিয়ে নিচে নামে বিঠলভাই। বিভাসের পাশে এসে দাঁড়ায় হামিদ হোসেন ও লোপামুদ্রা। তিনজনে দেখতে পায়, বিঠলভাই, তার প্রতিশোধের বোঝা কাঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে গেট পার হয়ে যাচ্ছে। স্তব্ধভাবে সেইদিকে চেয়ে থেকে হামিদ হোসেনের চোখে জল নেমে এল। বুড়ো হয়ে গেছে, মনটা বড়ো দুর্বল। সে প্রার্থনা করল, 'খুদা, বিঠলভাইয়ের বদলা নেওয়া যেন সার্থক হয়!'

পূরবীকে সেতার শেখানো শুরু করার পর একটি বছর কেটে গেছ। এই একটি বছরে যতো-না সেতার বেজেছে তার চেয়ে বেশি বেজেছে ওদের দুজনের মন। সেতারের তারগুলো সুর থেকে নেমে গেলে ওরা আবার সেগুলো বেঁধে নিয়েছে কিন্তু ওদের মনের তার যেন এক মুহূর্তের জন্যেও নামেনি। কখনো নতুন ক'রে দরকার বোধ হয়নি সেগুলো। দুজনের মন যেন সুরে সুরে টান হয়ে থেকেছে।

তাদের এই অনুরাগ আরো গভীর হয়েছে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতে, সেতার শিক্ষার সময়, বেড়াতে বেরুবার কালে, অহেতুক আলাপে ও আলোচনায়। কথা বলবার মতো বিষয় যখন ওরা খুঁজে পায়নি তখন কথা কয়েছে ওদের চোখের তারাগুলো, ব্যঞ্জনা ফুটেছে ব্যবহারের মাধুর্যে, কাব্য রচনা করেছে ভাষাহীন নীরব উপস্থিতি দিয়ে। প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে উপস্থিত হতে না পারলে ওদের দুজনের প্রতীক্ষা হয়েছে ব্যাকুল, অধৈর্য, উৎকণ্ঠিত।

লুকোবার প্রয়াস ওরা কেউ করেনি, তাই পরাশরবাবু এটা যেমন লক্ষ্য করেছেন মৈত্রেয়ী দেবীও তা লক্ষ্য না করে পারেননি। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী যথেষ্ট উদার প্রকৃতির, কন্যার খুশিতে তাঁরাও খুশি। কিন্তু যখনই তাদের নজর পড়েছে নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত সুপ্রিয়র প্রতি তখনই ওঁরা যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছেন। ওঁরা জানেন সুপ্রিয় আদিত্যবাবুর ছেলে, যাঁর জন্যে তাঁদের এতো বাড়-বাড়ন্ত। তাছাড়া, সুপ্রিয় ছেলেটি বড়ো ধীর নম্র ও শান্ত। সেই কোন্ ছোটবেলা থেকে এ-বাড়ির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, দিনে-দিনে এই ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে আরো, কিন্তু সুপ্রিয় কখনো কোন দাবি করেনি। এ-বাড়ির কারো প্রতি তার কোন দাবি আছে কিনা—তাও সে মুখ ফুটে কখনো জানায়নি। শুধু তার নীরব আগমনে সে-কথা সুস্পষ্ট হয়েছে।

ওর ধৈর্যের সীমা ও নিরাসক্তির অটলতা যে কতো গভীর—তা

বোঝা যায় সকালে বিভাস যখন সেতার শেখাতে আসে কিংবা সন্ধ্যাবেলা পূরবী যখন যায় সেতার শিখতে। দু'বেলাই সুপ্রিয় থাকে পূরবীর সঙ্গে। কিন্তু বাক্যহারা নীরব এবং নির্বিকার একটি মানুষ যেন সুপ্রিয়।

সকালবেলা বিভাস যখন আসে তখন পূরবী তুলে নেয় তার ড্রাগন-মাউথ তরফদার সেতারখানি। বলে, 'বিভাস, আজ তোমাকে একটি নতুন রাগ শোনাব।'

'নতুন রাগ?—'

'হ্যাঁ। নিজে নিজে শিখেছি।'

'প্রতিভাময়ী, সে-রাগের নামটি জানতে পারি?'

'বাজাই, শোনো।'

পূরবী বাজায় আর বিভাস শোনে। শুনতে শুনতে বিভাসের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ রাগ তারই নামের রাগ—'বিভাস'।

সন্ধ্যাবেলা পূরবী গিয়ে উপস্থিত হয় বিভাসের বাড়িতে। তাকে অভ্যর্থনা ক'রে বসতে বলে সে পেড়ে নেয় নিজের সেতারখানি। বলে 'পূরবী, তোমাকে আজ নতুন পাঠ দেবার আগে আমার পুরনো গৎখানা শুনে নাও।'

'পুরনো গৎ?'—

হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে আলাপের পর যে গৎখানা আমি প্রতিদিন বাজাই।'

'প্রতিভাবান, কি রাগের গৎ সেটি?

'শোনো, বাজাই।

বাজাতে থাকে বিভাস, আর পূরবীর বুকের ভিতরটি শিরশির করে ওঠে। এ গৎখানি তারই নামের রাগ—'পূরবী'।

এইভাবে 'এর পূরবী ওর বিভাস'; নিয়তই বেজেছে ওদের সেতারে। পূরবী বিভাসের নামে আর বিভাস পূরবীর নামে সেতার বাজিয়ে পরস্পরের মন ভরিয়ে দিয়েছে। দুজনের চোখে ও মুখে ফুটে উঠেছে সেই হাসি, হৃদয়ে ভরে উঠেছে সেই সুর।

শুধু তাদের দুজনের মাঝখানে নির্বাক হয়ে বসে থেকেছে সুপ্রিয়।

তার যতোক্ষণ প্রয়োজন থেকেছে, সে শুধু বাজিয়ে গেছে তবলা। পরে বলেছে, 'মণি, আমাকে কি আর দরকার আছে?'

'না। আমরা এখন আর সেতার বাজাব না।'

'আমি তবে আসি।'

'এসো।'

সুপ্রিয় উঠে চলে গেছে তারপর।

বিভাস বলেছে, 'বেচারী।'

পূরবী বলেছে, 'ছেলেমানুষ!'

ওদের দেখা হয় রোজই।

বিভাস বলে, 'জানো পূরবী, প্রথম দিনই আমি তোমাকে দেখে চমকে গিয়েছিলাম।'

'কেন?'

'মনে হয়েছিল যেন রাগ-রূপ প্রত্যক্ষ করলুম।'

'এখন বুঝি অন্য কিছু প্রত্যক্ষ করছো'

'হ্যাঁ তার নাম অনুরাগ-রূপ।'

'কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করো।'

বিভাস ফিসফিস করে ওর কানে কানে বলল, সখী, কী পুছসি অনুভব মোয়ে। সেই বিপরীত অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়।'

বলে ওকে নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরে মু'খে একটি চুম্বন এঁকে দেয়।

সেই সময় ওস্তাদ হামিদ হোসেন ঢুকছিল বিভাসের ঘরে, ওদের দুজনকে আলিংগনবদ্ধ অবস্থায় দেখে সরে যায়। তার মুখখানা অস্বাভাবিক কঠিন হ'য়ে ওঠে।

* * *

বাড়ি ফিরে সুপ্রিয় পড়ে যায় অন্তরার জেরার মুখে। অন্তরা বলে, 'দাদা, বিভাসবাবুকে মণি বিয়ে করবে, বাজারে জোর গুজব।'

'শুনেছি। এবং আশা করে আছি, একটা নেমতন্ন জুটবে।'

'তুমি যে এমন পেটুক তা জানতাম না।'

'আমি যে নির্লোভ নই, এটা অন্তত তোর জানা উচিত।'

'জানি। এবং, সেইখানেই আমার গোলমাল ঠেকছে!'

'তুই কি করতে বলিস্?'

'আমি তৃতীয় ব্যক্তি। আমার উপদেশ দেওয়া সাজে না। আমি শুধু এইটুকু বুঝি, হাত গুটিয়ে থাকলে যেখানে কিছু পাওয়া যায় না সেখানে হাত বাড়িয়ে দিতে হয়। তোমার জিনিস অন্য কেউ কেড়ে নেবে, এ তুমি সহ্য করো কি ক'রে? তুমি না পুরুষ?'

'ওরে, সেইজন্যেই আমি চুপ ক'রে আছি। তোর কাছে পুরুষ আর কাপুরুষের সংজ্ঞা কী তা জানিনে; কিন্তু চুপ ক'রে থাকার মধ্যেও একটা পৌরুষ আছে,—সেটা সকলে পারে না।'

'দাদা, এ-সংসারে দুটো হাত যার আছে এবং যে-পুরুষ সেই হাত দুটো ঠিক মতো চালাতে পারে, দেখা গেছে, জগৎ তার হাতের মুঠোয়। তারা শক্তিমান; এ-পৃথিবীতে তারাই বাঁচবার অধিকার অর্জন করেছে।'

'বোনটি, কার শক্তি কোথায় অনেক সময় তা খালি চোখে দেখা যায় না। আমার শক্তির প্রমাণ দিতে গিয়ে আমি যদি মারামারি ক'রে আসরে ঢুকি আর হাতাহাতি ক'রে বাসরে, তাহলে হাসবে আসরের লোক আর চিরকালের মতো মুখ ঘুরিয়ে থাকবে বাসরের লোকটি। বর হতে পারলুম না ব'লে তুই কি আমাকে বর্বর হতে বলিস?

অন্তরা নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল: 'দাদা, 'সংযম' কথাটার এক প্রান্তে আছে 'সং' আর অপর প্রান্তে আছে 'যম'। অতি সংযমী যারা তারা শেষ পর্যন্ত ওই দুটি শব্দের কোনো একটির শীকার হয়ে পড়ে; সেটা আরো করুণ।'

শুধু আমি নই, যমের হাত কেউই এড়াতে পারবে না। কিন্তু তুই আমাকে সঙ হতে দেখলি কখন?'

'কিছু মনে কোরো না তুমি। আগাগোড়া ব্যাপারটি ভাবলে আমার তাই মনে হয়। তুমি যেন মণি আর বিভাসবাবুর মাঝখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছো।'

'তোর দৃষ্টিভঙ্গি একান্তই তোর নিজস্ব। সেখানে আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু তুই বারবার যে ভুলটি করছিস সেটি হ'ল, কেতাবা ফরমূলা অনুযায়ী আমার মধ্যে ব্যর্থ-প্রেমের জ্বালা বা ঈর্ষা বোধ জাগেনি ব'লে ধরে নিয়েছিল, মণির প্রতি আমার ভালোবাসা আন্তরিক নয়। ওটা ভুল। মণির সঙ্গে আমার অনেক ছেলেবেলা থেকে আলাপ, ওকে নিয়ে তাই ছেলেখেলা করতে পারিনে। আমাকে আজ তোর সঙ মনে হতে পারে, কিন্তু জেনে রাখিস, আমার এই রূপটাই হ'ল সংগীত।'

'আবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, দাদা। ওই সংগীতের সংগতকার হতে গিয়েই তোমার কপালে শুধু জুটবে ফাঁকতাল।'

'তবু সান্ত্বনা থাকবে, 'ন বিদ্যা সংগীতাৎ পরা, গানাৎ পরতরং ন হি।'...তুই মানিস?'

'না। তার চেয়েও বড়ো জীবন।'

'সে তো ইহকাল।'

'আমি পরকালের প্রেম বিশ্বাস করিনা।'

'আমার কাছে প্রেম ইহকাল ও পরকাল।'

'তুমি এবার থেকে মিউজিয়ম-এ একটু জায়গা ক'রে নাও। লোকে তোমাকে দেখবে আর ভাববে, কী অলৌকিক পুরুষ!'

'তুই চটে গেছিস অন্তরা।'

'আমি চলি দাদা।'

অন্তরা চলে যায়। সুপ্রিয় টেনে নেয় তবলা। বাজাতে থাকে ত্রিতাল।

'রাগিনী সম্প্রদায়ে' বিভাস সেতার শেখায় আর পূরবীর পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালনা করে একটি অর্কেস্ট্রা পার্টি। ইতিমধ্যে ওদের কয়েকটি ফাংশন হ'য়ে গেছে এবং অর্জন করছে প্রচুর সুখ্যাতি। 'রাগিনী সম্প্রদায়ে'র নাম ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দ্দিকে। পূরবীর বান্ধবীর দল—ইরা শীলা করবী রঞ্জনা নন্দিনী প্রভৃতি খুব খুশি, কিন্তু আড়ালে-আবডালে পূরবীকে ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না। ইরা বলে, 'জানিস্ ভাই,

ভারতীয় সংগীতে পুরুষ ও প্রকৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে যুগে যুগে। এ-যুগেও তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখছি। আমরা এই নতুন রাগটির নাম রাখব 'বিভাস-পূরবী'—'

শীলা কীর্তন জুড়ে দেয়, 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুনে মন ভোর।'

করবী বলে, 'উঁহু'। বরং ওর পরের লাইনটা গাও: 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর!' মণি, তাই না?'

পূরবী বলে, 'তোরা বড়ো ফাজিল হয়েছিস। বিভাস তোদের গুরুদেব, তাকে নিয়ে ঠাট্টা?'

'কিন্তু, তিনি যে একজনের জীবনে গুরুতর দেব রূপে দেখা দিয়েছেন। তাকে কি ক'রে বাঁচাব, ভাই?'

'সে নিজেই আত্মরক্ষা করতে জানে।'

'বাঁচালি।'

খানিক পরে বিভাস এসে পড়ে। 'রাগিণী সম্প্রদায়ে' শুরু হয়ে যায় ক্লাস। নাচ, গান ও বাজনা চলে রাত ন'টা দশটা অবধি। ক্লাস শেষ হয়ে গেলে বেরিয়ে আসে বিভাস ও পূরবী। দুজনে হাঁটতে থাকে পাশাপাশি। পূরবী বলে এক সময়: 'গতকাল তুমি কি বলবে বলেছিলে যেন?'

'চলো, কোথাও একটু বসি।'

পার্কের একটি বেঞ্চে দুজনে বসে। রাত্রির আবছা আলোয় আশপাশ নিঝুম হয়ে থাকে। পিছনে ট্রাম-লাইনে অস্পষ্ট শোনা যায় ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ। শির-শির ক'রে বাতাস বয়। দূরে দপ দপ করে জ্বলে রঙ-বেরঙের আলো। চৌরংগী সেজে থাকে মোহিনী রূপে।

বিভাস তুলে নেয় পূরবীর একখানা হাত। বলে, 'পূরবী, কাল যে কথাটা বলা হয়নি আজ সেই কথাটা বলব। তুমি আমার সব কথা জানো না, তাই তোমাকে আমার জানানো দরকার যে আমার অতীত-গৌরব বলে কিছু নেই, সামাজিক মর্য্যাদা কিছু আছে কিনা জানিনা; আমি পিতৃ মাতৃহীন এবং লেখাপড়া ও গান-বাজনা শিখেছি এমন একজনের বাড়িতে যারা এ-সমাজে পতিত।'

'আর কি বলবে ?'

'এরপর তোমার স্বীকারোক্তি চাই।'

'বিভাস, তুমি যা বললে তা সব আমি শুনেছি মুদ্রাদিদির কাছ থেকে তিনি আমার শুভাকাঙ্খিণী। তাঁকে শ্রদ্ধা করি আমি। তাছাড়া, আজ আমরা এমন একটা সমাজে বাস করছি যেটা দ্রুত ভাঙছে এবং নতুন ভাবে গড়ে উঠছে। এই নতুন সমাজে আমরা মানুষের জন্মের চেয়ে তার কর্মকেই বেশি শ্রদ্ধা করতে শিখছি। সুতরাং, আমি একজন শিল্পীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে যাচ্ছি, এর মধ্যে ও-সব কথা না ওঠাই ভালো! আর আমি বিশ্বাস করি, শিল্পীর কোনো জাত নেই, তার কোনো সমাজ নেই। সে সব কিছুর ঊর্ধ্বে।'

'পূরবী, আমার একটা সংশয় ঘুচল। বড় ঘরের মেয়েরা প্রেম করে কিন্তু বিয়ে করার কথা উঠলেই জাতের কথা ভাবে, সমাজের কথা ভাবে। খুব খুশি হলুম তোমার কথা শুনে।'

'তোমার অন্য সংশয় কি ?'

'সেটা আমার ওস্তাদের তরফ থেকে। তুমি যেমন সহজেই তোমার বাপ-মার সম্মতি পাবে অতো সহজে ওস্তাদজীর সম্মতি আমি পাব কিনা সন্দেহ।'

'তাহলে এতদূর এগোলে কেন ?'

'পূরবী, ব্যাপারটা শোনো। একেবারে নিঃস্ব হয়ে কোলকাতায় এসেছিলুম, কতো রূঢ় আর হীন অভিজ্ঞতা যে লাভ করেছি! ঘটনাক্রমে মুদ্রাদিদির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তার আশ্রয়ে এসে উঠি। এমন মহৎ-প্রাণ মহিলা আমি কখনো দেখিনি তার এত ঋণ এ-জীবনে শোধ হবার নয়। কিন্তু ওস্তাদজীর আমার দ্বিতীয় জন্মদাতা। তিনি আমার সুরের গুরু। তাঁকে অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই। ভয় হ'ল সেইখানে।'

'ছাখো বিভাস, আমি আমার বাপ-মাকে শ্রদ্ধা করি। আরো অনেককে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাই বলে নিজে যেটা সত্য বলে জেনেছি সেটাকে বিসর্জন দেব কেন ?'

'আমার ওস্তাদজী প্রেম আর সংগীতকে একসঙ্গে স্বীকার করেন না।'

'তুমি স্বীকার করো?'

'করি।'

'তাহলে ওস্তাদজীর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলো। কি জন্যে লেখা-পড়া শিখেছো? এই সৎসাহস টুকু নেই?'

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল পূরবী।

'থাক্ পূরবী, আর বোলো না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, ওস্তাদজীর সম্মতি থাকুক্ বা না-থাকুক আমি আমার সত্য থেকে বিচ্যুৎ হব না।'

পূরবী বিভাসের হাতখানা টেনে নেয়। দুজনে চেয়ে থাকে মুখোমুখি। রাত গড়িয়ে চলে।

এরপর ঘটনা ঘটে গেল বড়ো দ্রুত। বিভাসকে তারজন্যে দায়ী করা যায় না।

লোপামুদ্রা কাশী থেকে ফিরে এসে বলল, 'ওস্তাদজী, কাশীতে আমার বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে।'

হামিদ হোসেন বলল, 'আফজল কি তোমার বাড়িতে থাকতে রাজি হয়েছ? আমার কথা বলেছিলে তাকে?'

হঁ্যা। তিনি থাকতে এবং বিভাসকে সেতার শেখাতে রাজি হয়েছেন।'

বিভাস ঘরের মধ্যেই ছিল। হামিদ হোসেন তাকে বলল, 'বেটা, তুমি তাহলে মুদ্রা-বেটির সঙ্গে কাশী চলে যাও। মুদ্রা-বেটি সাধন-ভজন নিয়ে থাকবে আর তুমি আফজলের কাছে সেতার শিখবে।'

হামিদ হোসেন তারপর নিজের মনে ব'লে চলল, 'বেটা, আফজলকে অনেক কষ্টে আমি রাজি করিয়েছি। সে আর কাউকে দীক্ষা দিচ্ছে না, তোমার ভাগ্য ভালো। সোয়ামী ঘরাণার খাঁটি জিনিসটুকু তুমি পাবে; আর একদিনও দেরি না ক'রে তুমি চলে যাও। আমার দিন তো শেষ হয়ে আসছে, আর ক'দিন। তুমি আফজলের কাছে গিয়ে দীক্ষা নিয়েছো জানতে পারলে আমার বুকটা হাল্কা হয়। তোমার উপর আমার অনেক আশা-ভরসা।'

বিভাস এতক্ষণে বলবার সুযোগ পেল এবং বলল, 'ওস্তাদজী, সংগীত শিক্ষা করব বলেই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। তোমার কৃপায় সেই সংগীতকে পেয়েছি। পরমগুরু ওস্তাদ আফজল আলি যাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে আমার এই সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে আরো একজনকে আমি জীবনে পেতে চাই।'

'তুমি কার কথা বলছো?'

'সে পূরবী। তুমি তাকে দেখেছো।'

তাকে পেতে চাও কেন?'

'আমি তাকে ভালোবাসি।'

হামিদ হোসেন একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। যেন সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। তার দুচোখে বোবা বিস্ময়। কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে ধীরে হামিদ হোসেন মুখ তুলল, অসম্ভব গম্ভীর মুখ। বলতে লাগল, 'তোমাদের দুজনকে আমি অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করেছি। এই আশংকাই আমি করেছিলাম। না বেটা, তা হয় না। আমি যে-গুরুর শিষ্য আফজলও সেই গুরুর শিষ্য। কামনা ও সাধনাকে সে একসঙ্গে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।'

'কিন্তু আমি ওকে কথা দিয়েছি।'

'ভুল করেছো। ভালোবাসার এই পাপ তুমি যাতে না করো তারজন্যে বার বার আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়েছি। তবু সেই পাপ তুমি করেছ। যাও, এখনো সময় আছে, তোমার কথা ফিরিয়ে নাও গে।'

বিভাসের মাথায় যেন ভূত চাপল, সে দৃঢ়স্বরে বলল, 'না ওস্তাদজী ভালোবাসা পাপ নয়। পাপ আছে নিজেদের মনে। পাপ হ'ল সত্যকে অস্বীকার করা।'

'আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পূরবী আমার জন্যে অনেক ত্যাগ করেছে আমি তারজন্যে এই সংস্কারটুকু ত্যাগ করব।'

'কোন্‌টা সংস্কার?'

'আমি বিশ্বাস করিনা সংগীতের সঙ্গে প্রেমের কোনো বিরোধ আছে।'

আলবৎ আছে। প্রেম দেহাশ্রয়ী, সংগীত দেবাশ্রয়ী। দেহের উপভোগে সংগীতের উপাসনা অপবিত্র হয়!'

কিন্তু দুটোই জীবনাশ্রয়ী। দেহের মধ্যেই আছে দেবের অধিষ্ঠান। তার বাইরে আর যা কিছু সব মিথ্যা।'

মিথ্যা! তাহলে বলতে চাও শাস্ত্র মিথ্যা! এতদিন ধরে আমরা যা বিশ্বাস ক'রে এলাম তা মিথ্যা! আমি, আফজল মিথ্যা, আমাদের গুরু সুন্দর স্বামী মিথ্যা! বেওকুফ—বেতমিজ—'

প্রচণ্ড একটা কাশির বেগ এলো, খক খক ক'রে উঠল হামিদ হোসেন।

লোপামুদ্রা সভয়ে বলল, ওস্তাদজী, শান্ত হও। বিভাস তোমার তর্ক থামাও।'

হামিদ হোসেনের কাশির সঙ্গে রক্তের ছিট উঠল। বুক চেপে ধরে কাশতে লাগল হামিদ হোসেনে। উত্তেজনা দমন ক'রে নিয়ে সে বলল 'বিভাস, ভদ্রা গেছে—তুমিও যাবে। আমি সে কালের লোক, পুরনো আমার মতবাদ,—তোমাকে ধরে রাখতে পারব না। বুড়ো হয়ে গেছি—মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনা সব সময়,—তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।'

বিভাসের সর্বশরীর যেন থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। সে চেপে রাখতে পারলনা নিজেকে, পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল বলল, 'ওস্তাদজী, আমি তোমার মনে আঘাত দিয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো।'

হামিদ হোসেন ওর মাথায় হাত রেখে বলল, 'বেটা তোমার মঙ্গল হোক।'

হামিদ হোসেন সেই রাত্রেই মারা যায়।

...তিন দিন তিন রাত কারোর সঙ্গে কথা বলল না বিভাস। খেলো না কিছুই; জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করল না। তার চেতনা যেন সম্পূর্ণ মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল। চতুর্থদিন তাকে কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক দেখা গেল। সে নিজের ঘরে বসে পূরবীকে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখল। তার কথা

হ'ল এই: 'পূরবী, আমি গুরু হত্যা করেছি। তার প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত আমি কিছুতেই শান্তি পাব না। আমি তোমার সব যুক্তি মেনে নিয়েছি, কিন্তু আমার হৃদয়াবেগের কাছে আমি অসহায়। ওস্তাদজীর শেষ ইচ্ছা আমাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। তাই, কাশীতে ওস্তাদ আফজল আলি খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্যে তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রেই চলে যাচ্ছি। সেখানে সংগীতের পাঠ সম্পূর্ণ করে ফিরে আসব। তুমি অপেক্ষা কোরো।'

চিঠিখানা লিখে ডাকে ফেলে দিয়ে এসে লোপামুদ্রাকে সে বলল, 'দিদি' চলো। আমি তৈরি।'

'এখুনি?'

'হাঁ।'

ওরা সেইদিনই কাশী রওনা হ'ল।

পূরবী পাঁচ বছর অপেক্ষা করেছিল। এই পাঁচ বছরে সে যে কতোভাবে নিজেকে ভেঙেছে, গড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ভাবতে তার কষ্ট হয়েছে বিভাস এতো নিষ্ঠুর। গোপনে সে চোখের জল ফেলেছে আর মুছেছে। প্রথম প্রথম সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। সকালে উঠে প্রতিদিন বিভাসকে স্মরণ ক'রে সে বাজিয়ে গেছে সেতার, বুকের ভিতর থেকে কান্না ঝরে পড়েছে; কিন্তু কেউ এসে সে-কান্না মুছিয়ে দেয়নি। কতো চিঠি লিখেছে পূরবী কিন্তু একটিরও উত্তর সে পায়নি। দীর্ঘ প্রত্যাশা অবশেষে সংশয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে কি তাকে ভুলে গেল বিভাস? সংশয়ের সঙ্গে দেখা দিয়েছে যন্ত্রণা। পূরবী যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে উঠেছে।

'রাগিনী সম্প্রদায়ে' সে আজও যায়। প্রথম দিককার পুরোনো বান্ধবী কিছু গেছে, পরিবর্তে পেয়েছে নতুন কিছু বান্ধবী। ঢেলে সাজিয়েছে সে 'রাগিনী সম্পাদায়'কে। ছাত্রীদের সংখ্যা বেড়েছে অনেক। উপার্জনের ক্ষেত্রে কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বিভাসের স্থানটিও শূন্য নেই, পূরবী যে নেই, পূরবী যে নতুন ওস্তাদটির কাছে সেতার শেখে তাকে এনে বসিয়াছে অর্কেস্ট্রা পার্টির পরিচালকরূপে,—নিজেও দেখাশোনা করে। নাচের বিভাগটি আরো উন্নত হয়েছে, পর্যায়ক্রমে তিনজন মাষ্টার আসেন, শেখানো হয় বিভিন্ন ধরণের নাচ। রবীন্দ্র সঙ্গীত আর আধুনিক গানের বিভাগ দুটি চালায় রেকর্ড ও রেডিও শিল্পী তার কয়েকজন পরিচিত বান্ধবী; গীটার সেতার সরোদ এবং বেহালার জন্যেও খোলা হয়েছে ক্লাশ। এতগুলো বিভাগ ম্যানেজ করা একা পূরবীর পক্ষে সম্ভব ছিল না, করবীর দাদা ললিত তাকে সাহায্য করল। ললিত ফিরেছে সম্প্রতি। দীর্ঘকাল লক্ষ্ণৌয়ে থেকে সেখানকার সঙ্গীত কলেজ থেকে পাশ ক'রে এসেছে সে। এসেই ভিড়ে গেছে 'রাগিনী সম্প্রদায়ে'। নতুন একটা ক্লাশের ভার সে নিজেই

নিয়েছে, উচ্চাংগ কণ্ঠসংগীতের ক্লাশ। সে সঙ্গে পূরবীকে উৎসাহিত ক'রে খুলে বসেছে একের পর এক বিভাগ কিন্তু সব দিন ললিতকে ভালো লাগে না পূরবীর। ললিত সব দিন স্বাভাবিক থাকে না।

করবী মাঝে মাঝে দাদার হ'য়ে ওকালতি করে 'ছাখ্ ভাই, শিল্পীদের অমন একটু আধটু দোষ থাকে। দাদা কিন্তু তোকে খুব শ্রদ্ধা করে। বলে, এ একটা অভিনব প্রচেষ্টা। বাংলা দেশে সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত একটা অর্কেস্ট্রা পার্টি,—আজ না—হোক পাঁচ-দশ বছর পরে রীতিমত সেন্সেশন ক্রিয়েট করবে।'

পূরবী দোলনায় শোওয়া করবীর বাচ্চাটিকে একটু আদর করে, বলে, 'শুনে সুখী হলুম।

'না, সত্যি ঠাট্টা না! আমার দাদা বরাবরই বাউণ্ডুলে, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কই রাখে না, কিন্তু এই একটি বছর তাকে যেভাবে তোর 'রাগিনী সম্প্রদায়' নিয়ে মাতামাতি করতে দেখছি তাতে শুধু আমি নয়, বাড়ির সকলেই অবাক হয়ে গেছে।'

'হয়তো গান বাজনা ভালোবাসেন, তাই এভাবে মেতে গেছেন।'

'সে একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু আমাদের ধারণা অন্য কোনো গূঢ় কারণ আছে।'

পূরবী গম্ভীর হ'য়ে বলল, 'সে কথা আমাকে শুনিয়ে কোনোলাভ নেই। এ ধরণের কথা যদি আবার আমাকে শুনতে হয় তাহলে 'রাগিনী সম্প্রদায়'কে অন্য কোথাও উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা, সর্বপ্রথম সেই কথাই আমি চিন্তা করব।,

করবী ওর কাঁধে হাত রেখে আন্তরিক ভাবে বলল, 'তুই এতো চটে যাবি তা আমি ভাবিনি। কিন্তু, বিয়ে তো তোকে একদিন করতেই হবে; কে বলতে পারে বিভাসবাবুর মতিগতি বদলে গেছে কিনা, আদপে তিনি ফিরবেন কিনা, তাই-বা কে জানে। এই পাঁচ বছরে তাঁর কাছ থেকে একখানি চিঠিও তো তুই পাসনি। দাদা যদি তোকে প্রত্যাশা ক'রে থাকে সেটা কি খুব অন্যায়?'

পূরবী কোনো কথা বলে না শুধু একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে চলে আসে ওর কাছ থেকে।

সুপ্রিয় ডাক্তারী পাশ ক'রে বাড়িতেই ডিসপেনসারি খুলে বসেছে। বাজারে সুনাম অর্জন করেছে, রোগিপত্তর নিয়েই অধিকাংশ সময় সে মেতে থাকে। তবলা বাজাবার ফুরসৎই নেই তার। কিন্তু রাত্রি আটটা কি সাড়ে আটটা বাজলে রোগিপত্তর কমে গেলে, একা একা ডিসপেনসারিতে বসে থাকতে থাকতে, রক্তের মধ্যে সে কী রকম একটা টান অনুভব করে। ডিসপেনসারি বন্ধ ক'রে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে মোটরখানা নিয়ে। করবীদের বাড়ির সামনে মোটর দাঁড় করিয়ে ধীর পদ-বিক্ষেপে ভিতর ঢোকে। প্রত্যেকটা ক্লাশের সামনে কিছুক্ষণ করে দাঁড়ায় তারপর গিয়ে ঢোকে পূরবীর ক্লাশে। একখানা চেয়ার টেনে চুপ ক'রে বসে থাকে। পূরবী ক্লাশ শেষ ক'রে তার সামনে আসে, বলে, 'চলো সুপ্রিয়দা।'

সুপ্রিয় পূরবীকে পৌঁছে দেয় বাড়ি।

এই ব্যাপারে আগে একটা তৃপ্তিকর কৌতুক বোধ করত পূরবী, আজকাল বিস্বাদ লাগে। এমন নীরব, স্বল্পভাষী লোকটির প্রতি কোনো আকর্ষণই যেন বোধ করে না সে। অথচ জানে, তারজন্যেই সব কাজ ফেলে মোটর নিয়ে ছুটে আসে সুপ্রিয়। কিন্তু মোটরের গদিতে ক্লান্ত পিঠ এলিয়ে দিলেই পূরবীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিভাসের মুখ—যে—মুখ শত চেষ্টা করেও সে ভুলতে পারছে না এবং যে মুখে সে এখন স্পষ্ট দেখতে পায় প্রতারণা আঁকা রয়েছে। বিষিয়ে ওঠে পূরবীর মন। আঘাত করার জন্যে কাল পাত্র বিবেচনা না ক'রে সে ডাকে, 'সুপ্রিয়দা?

সুপ্রিয় সাড়া দেয়, 'বলো।

'কই, তুমি তো আমাকে একদিনও বললে না?

'কী?'

'এই—তুমি আমাকে কত ভালবাসো—'

'ছিঃ পূরবী।'

'জানো সুপ্রিয়দা, ভারি অদ্ভুত লাগে তোমাদের মুখে ভালোবাসার ওই কথা গুলো শুনতে এতো আধো আধো, এতো মিষ্টি। তুমি একবারটি বলো, সুপ্রিয়দা। লক্ষ্মীটি—'

সুপ্রিয় ঘ্যাঁচ ক'রে ব্রেক কষে। হাত বাড়িয়ে মোটরের দরজা খুলে দেয়, বলে, 'যাও, নেমে যাও, পূরবী। তোমার বাড়ি এসে গেছে।

সেই রাত্রে প্রবল জ্বর এল পূরবীর। ভুগল প্রায় পনেরো দিন। জ্বরের ঘোরে এলোমেলো কত-কী বকল তার মধ্যে বিভাসের কথাই সবচেয়ে বেশি। সুপ্রিয় আসত এবেলা ওবেলা চিকিৎসা করত, সেবা করত। ললিতও আসত মাঝেমাঝে প্রথমদিকে করবীও এসেছে তারপর চলে গেছে শ্বশুর বাড়ী। অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর পূরবী একদিন বলল, 'আমার সঙ্গে একবার কাশী যাবে, সুপ্রিয়দা ?'

'কাশী ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তোমার শরীর যে এখনো—'

'বেশ, আমি একাই যাব।'

'কবে যাবে ?'

'কাল।'

'আচ্ছা যাব—

পরদিন সুপ্রিয়কে সঙ্গে নিয়ে কাশী রওনা হল পূরবী। অনেক ভেবেছে সে, কাশী না গিয়ে তার উপায় ছিল না। বেলা দশটার সময় কাশী পৌঁছুল তারা। টাঙ্গাওয়ালা পৌঁছে দিয়ে গেল লোপামুদ্রার বাড়ি। নতুন কোঠাবাড়ি করেছে লোপামুদ্রা। বাইরে থেকেই শোনা যাচ্ছিল ভিতরে কোথাও সেতার বাজছে। 'কী সুন্দর হাত হয়েছে বিভাসের—'মনে মনে বলল পূরবী।

বারাণ্ডায় উঠতেই দেখা হল লোপামুদ্রার সঙ্গে। চেনাই যায় না। ভারিক্কি হয়েছে শরীর, পরনে তসরের শাড়ি, হাতে পুজোর থালা।

লোপামুদ্রা মন্দিরে যাচ্ছিল, ওদেরকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, আরে মণি যে এসো এসো।

পূরবী বলল' 'বিভাসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বিভাস কোথায় দিদি?'

'ওই যে সেতার বাজাচ্ছে—' লোপামুদ্রা বলল, 'ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবে কিন্তু কথা বলা চলবে না।

'কেন?

'ওস্তাদজীর নিষেধ। বাইরের কারোর সঙ্গে বিভাস কথা বলে না।'

'আমি কিন্তু ওর কাছ থেকে কথা নেব বলেই এসেছি

'তাতে ওর ক্ষতি হবে, মণি। ওর সাধনা নষ্ট হবে।

• 'দিদি, এ তোমাদের কেমনতরো সাধনা। এ আমি মানিনা। ক্ষতি কি শুধু ওর একার হবে, কথা না বলে গেলে আমার যে অনেক ক্ষতি। সারা জীবনের ক্ষতি, দিদি।'

লোপামুদ্রা স্থির চোখের পানে তাকিয়ে বলল, ওস্তাদজীর সম্মতি থাকলে তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে পারো নইলে ডেকো না।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালো লোপামুদ্রা ঃ মণি এত অধৈর্য হতে নেই। প্রেমই বলো আর সঙ্গীতই বলো এ সংসারে বড়ো কোনো জিনিসকে পেতে হলে সাধনার মধ্যে দিয়েই তাকে পেতে হয়। আর, সাধনার সবচেয়ে বড় কথা হল ত্যাগ—

লোপামুদ্রা চলে গেল।

সরু বারাণ্ডার দিকে ভিতর মহলের কোনো ঘর থেকে ভেসে আসছিল সেতারের আওয়াজ।

পায়ে পায়ে ওরা দুজনে সেই ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা ভেজানো ছিল, পূরবী ঠেলা দিতেই খুলে যায়। ওরা দেখতে পায় ঠিক সামনেই শ্বেত-বসন বাগদেবীর একটি অপূর্ব মূর্তি। তাঁর পায়ের কাছে অর্ঘস্বরূপ টাটকা ফুল নিবেদন করা হয়েছে। বাগদেবীর দুপাশ থেকে উঠছে ধূপ ধুনোর ধোঁয়া। তাঁর সামনে মুখ ক'রে, ওদের দিকে পিছন ফিরে এক সাধক সেতার সাধনায় মগ্ন। সাধকের নগ্ন গাত্র, পরনে গেরুয়া

আলহাল্লা। এক মাথা ঝঁকড়া চুল দুই গালে চাপ কালো দাড়ি। সাধক সেতার বাজাচ্ছে আর অঝোর ধারে অশ্রু নেমেছে দুগাল বেয়ে। মনে হয় তার যেন কোন বাহ্যজ্ঞান নেই। পূরবী চমকে গেল। খুঁটিয়ে না দেখলে সে বিশ্বাসই করতে পারত না ওই সাধকই হল তার পূর্বপরিচিত বিভাস। সে ডাকতে যাচ্ছিল বিভাসকে পিছন থেকে একটি গম্ভীর গলা শোনা গেল এখানে কী চাই তোমাদের ?

ওরা ফিরে দেখল, একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ। এরও পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, গাত্র নগ্ন। সাদা দাড়ি বুক অবধি নেমেছে, কপালে বলি-রেখা, ভ্রু দুটি কোঁচকানো ; চোখে বিরক্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক যেন একটি মূর্তিমান নিষেধ। ওদের বুঝতে বাকি রইল না যে ইনিই ওস্তাদ আফজল আলী খাঁ। পূরবী বলল, 'ওস্তাদজী, আমি বিভাসের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ওস্তাদ আফজল আলী খাঁ বললেন, 'বিভাস বাজাতে বসেছে, এখন ও কারোর সঙ্গেই কথা বলবে না।'

'ওকে আমার ভীষণ দরকার।'

'তোমরা পরে এসো।'

'আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি।'

'তবু ওকে ডাকা চলবে না।'

পূরবী শুনল না ওস্তাদ আফজল আলি খাঁর নিষেধ। সে ডাকল, 'বিভাস! বিভাস!'

ওস্তাদ আফজল আলী খাঁ ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাগে তাঁর সর্বশরীর কাঁপছিল।

'আমি তোমাকে বারণ করছি তবু তুমি ওকে ডাকছো ?—'

সুপ্রিয় ওর হাত ধরে টানল।

কিন্তু পূরবী যেন ক্ষেপে উঠল, উত্তেজনায় তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বলল, 'না, আমি যাব না। ওদের এ-সব গোঁড়ামি আমি মানিনা। বিভাসকে সঙ্গে নিয়ে তবে আমি যাব।'

বলে সে ঘরের মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল : বিভাস! বিভাস!

তুমি আমার ডাকে সাড়া দাও। এই অপমানের হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও!'

সাধক সেতারী একবার মাত্র পিছন ফিরে তাকাল। পূরবী তার জলে-ভাসা মুখ খানা তুলে ধরল।

...একটি অসহ্য মুহূর্ত!

তারপরই সাধক আবার ডুবে গেল সেতার সাধনায়।

'বিভাস!'

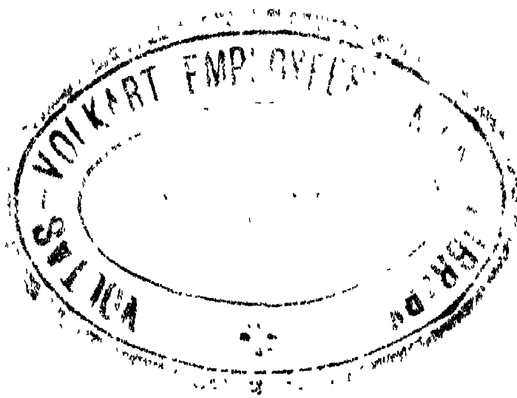
ফের ডাক দিল পূরবী।

সাধক আর ফিরে তাকাল না।

ওস্তাদ আফজল আলী খাঁ বললেন, 'ওকে বৃথা ডাকছো। বিভাস কারো ডাকেই সাড়া দেবে না। ওর সাধনায় বিঘ্ন ঘটিও না। তোমরা এবার চলে যাও।'

অপমানে, লজ্জায়, ধিক্কারে পূরবী ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সুপ্রিয় এল তার পিছন-পিছন।...

বিভাস তখনো সেতার বাজিয়ে চলেছে।



আভোগ

'আরো পাঁচ বছর লাগল আমার সংগীত-শিক্ষা শেষ হতে। পাঁচ বছরের বেশিই লাগত কিন্তু ওস্তাদজী অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন, দ্রুত শেষ করলেন আমার শিক্ষার পাঠ। একেবারে বুড়ো হ'য়ে গিয়েছিলেন ওস্তাদজী, এবারে বিছানা নিলেন। দিদি গত হয়েছিলেন তার আগেই, ছিলাম শুধু আমি আর ওস্তাদজী। অসুস্থ হ'য়ে পড়ার পর থেকে ওস্তাদজী একেবারে ছেলে মানুষের মতো আমার উপর নির্ভরশীল হ'য়ে পড়েছিলেন। আমিই তাঁকে খাইয়ে দিতাম, ওঠাতাম, বসাতাম, শুইয়ে দিতাম। কোথাও বেরুবার উপায় ছিল না আমার। ওস্তাজীকে সেতার শুনিয়ে আর সেবা করেই আমার দিন কাটত।

কিন্তু বেশিদিন বাঁচলেন না ওস্তাদজী। তাঁর মৃত্যুর পর ওখানকার মুসলমান-সমাজে একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সমাধি দেওয়ার ব্যাপারে কেউই এগিয়ে এল না। দীর্ঘকাল না-হিন্দু না-মুসলমান হ'য়ে থাকার ফলে ওঁর প্রতি স্বজাতিরা বিরূপ ছিল। আমি ওদের মসজিদের ইমামকে গিয়ে ধরলাম। তাঁরই সাহায্যে ওস্তাদজীকে কবর দিয়ে অনেকদিন পরে আমি যেন একটু হাল্কা হলাম। ঘুরে বেড়ালাম চারদিকে। এতকাল কাশীতে আছি, ভালো করে কিছুই দেখা হয়নি কিছুদিন শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম।

আমি তখন সম্পূর্ণ একা। দিদি নেই ওস্তাদজী নেই—চারপাশ থেকে বাঁধন ছিন্ন হ'য়ে যাওয়ায় আমি বার বার নিজের মুখোমুখি হয়ে

পড়ছিলাম। এ-দশটা বছর যেন ঘোরের মধ্যে কেটে গেছে। কী থেকে কী হ'য়ে গেল। সব মনে পড়ছিল। দুই ওস্তাদের কথা, দিদির কথা, বিঠলভাই ও ভদ্রার কথা। আর মনে পড়ছিল, পূরবীর কথা। ফাঁকা শূন্য বাড়িতে একা-একা সেতার বাজাই, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু বেশ টের পাই আমার রক্তের মধ্যে পুরোনোদিনের স্মৃতি পাখার ঝাপট মারছে। ভাবতে থাকি ওস্তাদ আফজল আলি খাঁ আমার সাধনায় প্রসন্ন হয়ে মারা গেছেন, তাঁর আশীর্বাদ আমি পেয়েছি; ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁর শেষ ইচ্ছা আমি পূর্ণ করেছি। তাঁরা তৃপ্ত। কিন্তু আমার রক্তের মধ্যে একটি মেয়ের অতৃপ্তি যেন বারংবার জ্বালা ধরায়। আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না, আমার কাছ থেকে একজন তীব্র অপমানের আঘাত নিয়ে ফিরে গেছে—যাকে আমি ভালবাসি, যে আমার রক্তের মধ্যে মিশে রয়েছে। দিদি মারা যাবার সময় ব'লে গিয়েছিলেন, 'তোদের দুজনকে আশীর্বাদ করে গেলাম!' আমি মাথা পেতে নিয়েছি সেই আশীর্বাদ, কিন্তু সেই একজন?

দিদি নিজে অর্থব্যয় করে বাড়িটি করে ছিলেন। মারা যাবার সময় কাশীর বাড়ি আর কোলকাতার বাড়ি আমাকেই দান করে যান। শূন্য বাড়িটিতে ঘুরে ঘুরে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। একদিকে দিদির আশীর্বাদ অপরদিকে ওস্তাদজীর সাবধানবাণী: 'সাধনা আর কামনা একসঙ্গে চলে না, জীবনে একটাকে বেছে নিতে হয়—এই দুয়ের মধ্যে লাগল প্রচণ্ড সংঘাত, আমার চিত্ত হয়ে উঠল বিক্ষিপ্ত। গিয়ে বসলাম দশাশ্বমেধ ঘাটে। কোন্‌টা আমি নোব? কি আমি চাই দুই ওস্তাদ ভেবেছিলেন সংগীতের মধ্যে ডুবে গেলে আমি সাধনা ছাড়া আর কিছুই চাইব না। কিন্তু সংগীত আমি পেয়েছি তবু এই আকাঙ্খা কেন? প্রেম কি সংগীতের বিরোধী? সত্যই কি তা শুধু স্থূল দেহ ভোগ? সেই দশাশ্বমেধ ঘাটে বসেই আমি চিৎকার করে উঠলাম, না না না। কিছুতেই না প্রেম ও সংগীতে কোনো বিরোধ নেই।

সুতরাং স্থির হয়ে বসে থাকা সম্ভব হল না। আমি প্রায়শ্চিত্তের কাল সম্পূর্ণ করেছি, এবার আমি মুক্ত। দুই ওস্তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

মাথা অবনত করে সেইদিনই আমি বেরিয়ে পড়লাম কাশী থেকে, চললাম কোলকাতায়। পূরবী আমাকে ডাকছে,

তাকে আমার চাই-ই।...

কিন্তু পূরবীর সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার পর কেটে গেছে পাঁচটি বছর। পৃথিবী আমার জন্যে অপেক্ষ করে থাকেনি। কেটে গেছে দিন, মাস, বছর। বদলে গেছে মানুষ, মন, মেজাজ। আমি এক জায়াগায় স্থির হয়ে থাকলেও পৃথিবী স্থির হয়ে থাকবে কেন?

গঙ্গাধরের উপর কোলকাতার বাড়ির দেখাশোনার ভার ছিল। দশ বছর ধরে সে বাড়ি আগলাচ্ছিল। আমি এসে উঠলাম কোলকাতার এই বাড়িতে। ঘুরে ঘুরে দেখলাম প্রত্যেকটি ঘর। কতো স্মৃতি, কতো অশ্রু। অব্যক্ত কতো প্রাণের বেদন, অশ্রুত কতো সংগীতের সুর। আজ যেমন দেখলে ওস্তাদজীর ঘরের দেয়ালে সারেংগী ঝুলছে, বিঠলভাইয়ের ঘরে পড়ে রয়েছে ফাঁসা ডুগি তবলা, তুঙ্গভদ্রার ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে শেষস্মৃতি একজোড়া ঘুঙুর আর দিদির ঘরে ধুলো জমা একটা তানপুরা—সেদিন ও ঠিক তাই ছিল। ওগুলোতে আমি হাত দিইনি, গঙ্গাধরকে ও হাত দিতে বারন করে গিয়েছিলুম। থাক্। একটা প্রানবন্ত আসরের স্মৃতি এমন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে থাক্। আমি শুধু আমার ফাঁকা ঘর সাজিয়ে নিলাম।

আমি আর গঙ্গাধর। কয়েকটা দিন কাটার পর রেডিওতে সেতার বাজানো শুরু করলাম তুমি হয়তো সে প্রোগ্রাম শুনে থাকবে। আগে তো সুনাম ছিলই, আবার ফিরে এসেছি দেখে পূর্বেকার অনেক পরিচিত অপরিচিত শুভানুধ্যায়ী অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। আবার ভরে উঠল আমার ঘর। এলো শীতের মরশুম। ডাক পেলুম কয়েকটি সংগীত জলসা থেকে। শরীর ভালো ছিল না তবু সব কটি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। ইতি পূর্বে রেডিওতে বাজিয়েছি 'পূরবী', জলসাগুলোতে ও পূরবী বাজাতে লাগলাম। প্রথম প্রথম ইচ্ছা করেই বাজিয়েছি, উদ্দেশ্য পূরবী

যদি এসে থাকে তাহলে আমাকে চিনে নিক; আমি তাকে ভুলিনি। কিন্তু শীতের মরশুম চলে গেল, এল না পূরবী। তখন চিন্তায় পড়লাম। ভাবলাম ওর অভিমান বুঝি এত অল্পে ভাঙবে না, আমাকেই যেতে হবে ওর কাছে। যা অভিমানিনী মেয়ে! ঠিক করলাম তাই যাব। একদিন সন্ধ্যার পর গিয়ে উপস্থিত হলাম পূরবীদের বাড়ি।

পরাশরবাবু ছিলেন, অনেক বৃদ্ধ হয়েছেন তিনি। মৈত্রেয়ী দেবী ছিলেন, তাঁর সামনের চুলে রূপোলি রেখা। আমি তাঁকে 'মাসিমা' বলে সম্বোধন করলাম—সেই পুরোনো সম্বোধন। দশ বছর পরে দেখা। দেখলাম এঁরা কিছুই বদলাননি। তেমনি সাদরে অভ্যার্থনা করলেন আমাকে, সুখ-দুঃখের কথা হ'ল। চা দিয়ে গেলেন একটি তরুণী মহিলা। মাথায় ঘোমটা ঢাকা; সিঁথিতে সিঁদুর। চিনতে পারলাম, ইনি অন্তরা দেবী। আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে অন্তরা দেবীর। কুমারীত্ব থেকে বধূত্বে এসে যেমন নম্র তেমনি ধীর। কুশল জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি হেসে বললেন যে, ভালই আছেন। তাঁর বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে ছিলাম কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। মনে পড়ল, দীপকবাবুর সঙ্গে অন্তরা দেবীর বিয়ের একটি নিমন্ত্রণপত্রের কথা দিদি যেন একবার বলেছিলেন আমাকে। ঘাড় নেড়ে জানালাম, হাঁ পেয়েছিলাম। তিমি ঘোমটা টেনে চলে গেলেন অন্যঘরে। খানিক পরেই ঢুকল দীপক। ঠিক তেমনিই আছে। বাবার বয়স হ'য়ে যাওয়ায় কারবার দেখা শোনা সে এখন নিজেই করে। মেজাজটি আছে সেই রকম। ক্রিকেট ফুটবল ছাড়া কথাই নেই। ভালো খেলা এলে আজও তার দেখা চাই-ই। সাগর পারে কোন্ মাঠে ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট হচ্ছে তার রীলে শোনবার জন্যে সে উঠে গেল। এই ঘরে প্রথম যেদিন আসি সেদিন কতো বাদ্যযন্ত্র দেখেছিলাম, একটিও নেই। আমি প্রতিটি মুহূর্ত অপেক্ষা করছিলাম এইবার পূরবী আসবে। কিন্তু পূরবী এল না। তার কথাও কারো মুখে শুনলাম না। বসে থাকতে থাকতে একটা প্রবল আতংক বোধ করলাম। তবে কি পূরবী বেঁচে নেই? আশংকায় আমার সারা অন্তর কেঁপে উঠল।

পরাশরবাবু অবশেষে পূরবীর কথা তুললেন: বললেন, বহুদিন

তোমার সেতার শুনিনি বিভাস. একদিন এসে শুনিয়ে যেও। মনির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে এ-বাড়িতে আর সেতার বাজে না—'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। কোনোমতে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে এলাম। বিয়ে হ'য়ে গেছে পূরবীর? ভয়ংকর একটা ধাক্কা খেলাম। পরক্ষণে তীব্র ক্ষোভে মন ছেয়ে গেল। আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করতে পারল না? পূরবীর এতো ভঙ্গুর প্রেম? সমস্ত আগ্রহ ও উৎসাহ নিমেষে জল হ'য়ে গেল। ভাবলাম, কী লাভ থেকে কোলকাতায়, কাশী চলে যাব। মনটা কয়েকদিন ধরে বিক্ষিপ্ত হয়ে রইল। ভালো লাগে না চুপচাপ বসে থাকি আর রেডিওতে গিয়ে সেতার বাজাই। কাশী যাব যাব করেও যেতে পারলাম না। কী যেন টানে, কে যেন টানে। একদিন বিকেলে একটি মোটর এসে থামল এই বাড়ির গাড়ি বারাণ্ডায়। গঙ্গাধর এসে জানাল এক বাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। বললাম, 'নিয়ে এসো।' অনেকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিনি। কিন্তু এলেন সুপ্রিয়বাবু। নিখুঁত সাহেবী পোশাক। আরো সুদীপ্ত হয়েছেন। নমস্কারকরে বললেন, 'অনেকদিন থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করব ভাবছিলাম। কিন্তু রোগিপত্তরের চাপে সম্ভব হচ্ছিল না। আজ এইদিকে একটা 'কল্' ছিল, ফেরার পথে নেমে পড়লাম—'

আমি বললাম, 'বেশ করেছেন।'

সুপ্রিয়বাবু বললেন, 'রেডিও-মারফৎ আপনার সেতার শুনেছি, কিন্তু কোনো জলসায় যোগদান করতে পারিনি। আপনার হাত অপূর্ব হয়েছে। আমাদের বাড়িতে একদিন সেতার বাজিয়েছিলেন, মনে আছে? তেমনি মুখোমুখি বসে আপনার সেতার শুনতে ইচ্ছে হয়।'

সুপ্রিয়বাবু বরাবরই কম কথা বলেন। আজ এতগুলো কথা একসঙ্গে বললেন দেখে মনে হল, পূরবীকে পেয়ে ওর জীবন পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, তাই রুদ্ধ কথার দ্বার খুলে গেছে। একটা জ্বালা বোধ করলাম। বললাম, 'আমার সেতার যদি আপনার ভালো লেগে থাকে সে তো আনন্দের কথা। আপনার বাড়িতে আয়োজন করুন, একদিন মুখোমুখি বসে সেতার শুনিয়ে আসব।

উদ্দেশ্য ছিল পূরবীকে দেখা এবং তাকে আঘাত করা। অক্ষম ক্ষোভ এ ছাড়া আর কী করতে পারে। পূরবী আমার দেওয়া আঘাতের যন্ত্রণায় ভুগছে এটা দেখলেও খুশি হই। আমার বুকের ভিতর জ্বলে যাচ্ছিল। সুতরাং সুপ্রিয়বাবুর নির্ধারিত দিন-ক্ষণ অনুযায়ী একদিন গিয়ে উপস্থিত হলাম তাঁর বাড়ি। বাইরের ঘরটি ডিসপেনসারি। সুপ্রিয় বাবুকে ব্যস্ত দেখলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে উপরের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। অন্তরা দেবী ছিলেন সেই ঘরে। তাঁকে বোধ হয় আনানো হয়ে ছিল শ্বশুরবাড়ি থেকে। তিনি যোগ্য সমাদর করলেন। ঘরখানা সাজানো হয়েছে। একটি মনোরমা শিল্পরুচি উঁকি মারছিল ঘর-সাজানোর ভিতর থেকে। বিশেষ ক'রে আমি যে রজনীগন্ধা ভালোবাসি তাঁর একটি তোড়া দেখে মন খুশি হয়ে উঠল। কিছুই ভোলেনি তাহলে পূরবী ? কিন্তু এখনো আসছে না কেন সে ? রোগী পত্তর দেখা শেষ করে খানিক পরে ঢুকলেন সুপ্রিয়বাবু। বললেন, 'আমার একটু দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না। নিন বাজান—'

বাজাব বলেই এসেছি। কিন্তু আমি বার বার তাকাচ্ছিলাম দরজার দিকে। এতো ব্যস্ত সংসারের কাজে ? একবারও আসতে পারে না ? আবার একটা রুদ্ধ ক্ষোভ আর অভিমান অন্তর আমার ছেয়ে ফেলছিল। অন্তরা দেবী বসেছেন একটু দূরে, সুপ্রিয়বাবু আমার সামনে। ঠিক করলাম, 'পূরবী বাজাব আমি। একবার যদি এই রাগ শুনতে পায় তাহলে সে না এসে কিছুতেই থাকতে পারবে না। 'পূরবী' ওর সারা শরীরে দারুণ উত্তেজনা ছড়ায়, আমি কতোদিন লক্ষ্য করেছি। ধরলাম 'পূরবী'। কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাজানোর পরেও দেখি পূরবী এল না। আমার মনে আবার একটা ভয় দানা বাঁধতে লাগল। সেই অহেতুক ভয়। আমার বাজনা এলোমেলো হয়ে গেল। সেতার নামিয়ে রেখে বললাম। 'আজ থাক্ এই পর্যন্ত—'

অন্তরা দেবী উঠে গেলেন চা আনবার জন্যে।

আমি সুপ্রিয়বাবুকে বললাম, 'আপনার স্ত্রীটিকে কি সিন্দুক বন্ধ করে রেখেছেন সুপ্রিয়বাবু ?'

সুপ্রিয়বাবু বললেন, 'আমার স্ত্রী? কী বলছেন আপনি? আমি তো বিবাহই করিনি!'

'বিবাহই করেননি?' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাহলে পূরবী—'

'আপনি মস্ত ভুল করেছেন বিভাসবাবু। পূরবী কাশী থেকে ফিরেই বিবাহ করেছে করবীর দাদা ললিতকে। সে এখন শ্বশুরবাড়িতে। রাগিণী সম্প্রদায় চালায় আর স্বামীর ঘর করে। আপনার সঙ্গে তার দেখা হয়নি?'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এ কী অসম্ভব কাণ্ড। সুপ্রিয়বাবুর মুখের দিকে তাকালাম, সে মুখ বিষাদ কিংবা বেদনা কিছুই নজরে পড়ল না। আশ্চর্য শান্ত আর নির্বিকার সুপ্রিয়বাবু। আমি হতবাক। তিনি বললেন, 'মাঝে মাঝে আমাকে ওদের বাড়ি যেতে হয়। পূরবীর একটি ছেলে হয়ে মারা গেছে। ললিতবাবুর পেটে একটা যন্ত্রণা হয়, সেটা বাড়লে পূরবী আমাকে ডেকে পাঠায়, আমি গিয়ে ইনজেকশান দিয়ে আসি।—

আমার মুখ দিয়ে শুধু বেরুল, 'কেমন আছে পূরবী?

সুপ্রিয়বাবু বললেন ভালই আছে একদিন গিয়ে দেখেই আসুন না।

সংবাদটির আকস্মিকতায় আমি একেবারে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। পূরবী শেষ পর্যন্ত এ কী করল? সুপ্রিয়বাবুকে ছেড়ে ললিত? এ যে আমি কল্পনাও করিনি। সারাটা রাত ঘুমুতে পারলাম না। সারাদিন এলোমেলো ভাবে ঘুরে কাটালাম। সন্ধ্যার পর গিয়ে দাঁড়ালাম করবীদের বাড়ির সামনে। দেখলাম রাগিণী সম্প্রদায়ের ক্লাশ চলছে। কোনো ঘর থেকে গানের গলা আসছিল রবীন্দ্রসংগীত আধুনিক উচ্চাংগ সংগীত। 'রাগিণী সম্প্রদায়' জমে উঠেছে। আবছা আলোয় কয়েক-জনকে এদিক ওদিক যাতায়াত করতে দেখলাম। একটি বড়ো হল্ ঘরে গিয়ে জুটল কয়েক জন মহিলা। তার পর শুরু হ'ল সম্মিলিত বাজবৃন্দ। পূরবীর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। মনে মনে খুশি হলাম। কিন্তু ভিতরে ঢুকতে ইতস্তত করতে লাগলাম। কতোক্ষণ এই ভাবে

দাঁড়িয়ে ছিলাম জানিনা, রাত একটু গভীর হ'ল, ভেঙে গেল 'রাগিণী সম্প্রদায়ে'-র ক্লাশ। একে একে বেরিয়ে যায় সকলে। আলো নিবে যায় ক্লাশগুলোর। নিঝুম হ'ল বাড়ি। আমি এগিয়ে গেলাম।

দেখা হ'ল একটি চাকরের সঙ্গে।

বললাম, 'ললিত বাবু আছেন ?'

'হ্যাঁ। ওই ঘরে যান্।'

করবীদের বাড়িতে আমি আগে অনেকবার এসেছি। চাকর যে ঘরটি নির্দেশ করল সেটি নিচেরই একখানা ঘর, কিন্তু বরাবর বন্ধ থাকত। করবী দেবী একবার বলেছিলেন, 'ওটা আমার দাদার ঘর, দাদা এলে খোলা হয়, না হলে বন্ধ থাকে।' গিয়ে দাঁড়ালাম সেই ঘরের সুমুখে। দরজার পাল্লা খোলা ছিলো। দেখলাম, করবী দেবীর দাদা ললিত বাবু বসে রয়েছেন চেয়ারে একটু অস্বাভাবিক ভংগিতে, হাতে মদের গেলাস। মুখেতে বিকৃতির চিহ্ন। সম্ভবত পেটের সেই যন্ত্রনা। আমি চলে আসব কিনা ভাবছিলাম কিন্তু তার আগেই ললিতবাবু আমাকে দেখতে পেলেন এবং ডাক দিলেন, 'কে ওখানে ? কি চাই ?'

আমি ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। হাত তুলে নমস্কার ক'রে বললাম, 'আপনি আমাকে ঠিক চিনবেন না। আপনার স্ত্রী পূরবী দেবী আমাকে চেনেন। অনেকদিন পরে কোলকাতায় এসেছি, তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করব।'

'আপনার নাম ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

নাম বললাম।

'কি করেন ?' পুনঃ জিজ্ঞাসা।

বললাম, 'পূরবী দেবীকে আমি সেতার শেখাতাম।'

'তাহলে আপনিই সেই বিভাস মুখোপাধ্যায় ?...' বিড়বিড় করে আরো কি বললেন ললিতবাবু। আমি বললাম, 'তাঁকে যদি একটু ডেকে দেন...'

সঙ্গে সঙ্গে ললিতবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন : 'আমার স্ত্রী কারো সঙ্গে দেখা করেন না। আমাকে বলে যেতে পারেন আপনার বক্তব্য—'

'আপনি তাঁকে আমার নাম বলুন। নিশ্চয়ই দেখা করবেন।'

'না। করবেন না।'

'আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কেন?'

'কেন?' গেলাসটা ঠকাস ক'রে টেবিলের ওপর রাখলেন ললিতবাবু; হঠাৎ বিশ্রীভাবে চিৎকার করে উঠলেন, 'Get out, Get out, I say—'

আমার কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠল। তক্ষুনি বেরিয়ে আসা উচিত ছিল আমার,—কিন্তু যেন রোখ চেপে গেল। একটা মাতালের অপমান গায়ে মেখে পূরবীকে ভুল বুঝবো?

বললাম, 'পূরবীর সঙ্গে দেখা ক'রে তবে যাব।'

'আমি বলছি তবু যাবেন না?'

'না।'…

ঠিক সেই সময় পূরবী এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

'এতো চেঁচামেচি কিসের? ডাক্তার তোমাকে বেশি উত্তেজিত হতে বারণ করেছে, না?'

'উত্তেজিত হচ্ছি কি সাধে?…Look. তোমার পয়লা নম্বর প্রেমিক এসে হাজির।—আমাকে কতো সহ্য করতে বলো? After all, আমিও একজন মানুষ।'

পূরবী আমার কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'আপনি আমার অসুস্থ স্বামীকে এভাবে উত্তেজিত করছেন কেন? তিনি যখন চান না তখন আপনি চলে যান।'

তার চোখে দারুন ভৎ'সনার দৃষ্টি।

বললাম, 'পূরবী, আমি তোমার স্বামীকে উত্তেজিত করতে চাইনি। তোমার সঙ্গে শুধু দেখা করবার কথা বলেছিলাম।'

পূরবী বলল, 'আমি এতো রাত্রে কারো সঙ্গে দেখা করি না সে কথা তো শুনেছেন।'

'আমি তোমার জন্যেই কোলকাতায় ছুটে এসেছি পূরবী। তুমি—'

'অসভ্য!—পরস্ত্রীর সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় তা এখনো

জানেন না!' তীব্রস্বরে পূরবী বলল, 'আপনাকে বলছি, চলে যান আপনি, এক মুহূর্ত এখানে থাকবেন না।'

আমি ছিটকে বেরিয়ে এলাম।

…যদি ওর কথার সুর আমি না চিনতাম, যদি ওই 'অসভ্য' কথাটুকু সে না বলত, তাহলে আমি যে কী করতাম তা জানিনা। বোধ হয় ওর বেশি বলবার কোনো উপায় ছিল না পূরবীর। কিন্তু আমার সারা অন্তরে তখন তীব্র অপমানের বৃশ্চিক জ্বালা ছড়িয়ে পড়েছে। পূরবী এতো নিষ্ঠুর! তার প্রতিশোধ এতো ভীষণ!

বুঝতেই পারছো—তখন আমার মনের অবস্থা কতো খারাপ। প্রতিটি মুহূর্ত কোলকাতাকে অসহ্য বোধ হতে লাগল। একটি দিনও তিষ্ঠতে পারলাম না। পরদিন সকালেই গঙ্গাধরকে আমার ঘরে তালা লাগাতে বলে স্যুটকেশ আর সেতারখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অনির্দেশ্যভাবে কিছুদিন এখানে ওখানে ঘুরলাম। ফের গিয়ে উঠলাম কাশীতে। ঠিক করলাম ওইখানেই থেকে যাব, সাধন ভজন করব আর সেতার বাজাব। ঘেন্না ধরে গেল জীবনে। দুই ওস্তাদকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বললাম, 'সেদিন বুঝিনি তোমাদের কতোখানি সত্যদৃষ্টি ছিল। হে সত্যদ্রষ্টা ঋষি যুগল, তোমরা আমাকে ক্ষমা করো…,

কাশীতেই থেকে গেলাম তারপর। নিজেই রাঁধি, এদিক ওদিক ঘুরি, আর সেতার বাজাই। কিন্তু জানো শ্রীমন্ত, যতোই গলা কাটিয়ে চিৎকার করে বলি না কেন, প্রেম আমার জীবনে অভিশাপ,—মন তা মানতে চায় না। সংগীতের মতোই পূরবীর প্রেম আমার জীবনে সত্য, তাকে এতো সহজে অস্বীকার করি কি করে? রাগ পড়ে, গেলেই ওর কথা মনে পড়ে। বিশেষ করে ওই 'অসভ্য' কথাটি আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। কয়েক মাস কাটল। আবার অস্থির হয়ে পড়লাম। কাশী ভালো লাগল না। মন বলল, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।' বেরিয়ে পড়লাম কাশী থেকে। কিন্তু কোথায় যাব? ঘুরলাম দক্ষিণ ভারত। কিছুকাল কাটালাম মধ্য ভারতে। সেখান থেকে ফিরলাম দিল্লী। গেলাম এলাহবাদ, লক্ষ্মৌ, আগ্রা সব জায়গাতেই

সেতার বাজালাম; বেশ নাম হল। অবশেষে ফের দিল্লীতেই ফিরলাম। সেখানকার রেডিও স্টেশানে নিয়মিত শিল্পী হিসেবে গণ্য হলাম। কিন্তু কোলকাতার রসিক শ্রোতারা আমাকে ছাড়বে কেন? শীতের মরশুম এলেই তারা আমাকে ডাকে। তাদের সব ডাক উপেক্ষা করা সম্ভব হত না, তাই আসতে হত কোলকাতায়। কিছুদিন থাকতাম আবার চলে যেতাম্। প্রথমে অতটা খেয়াল করিনি, পরে বন্ধু বান্ধবরা সচেতন করে দিল, ব্যাপারখানা কী? প্রতিবার এসে আমি ওই একই রাগ বাজাই কেন? আমি কি পূরবী ছাড়া অন্য কোনো রাগ বাজাতে পারিনা? এ নিয়ে সেদিনও বেশ অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। তারপর সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বৃথা। কোলকাতায় এলেই আমার সেতার কেঁদে ওঠে পূরবীর নামে।

বন্ধুদের পরামর্শে কোলকাতায় আসা বন্ধ ক'রে দিলাম। শুনে অবাক হবে, এক মনোচিকিৎসকের অধীনে আমার এই অদ্ভুত মানসিক দশার চিকিৎসা পর্যন্ত করিয়েছিলাম দীর্ঘকাল। কিন্তু কোনো ফল পাইনি।

আট বছর ধরে দিল্লীতে আছি। ওখানকার সংগীত সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছি। সংগীত একাদেমি কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছি আমি। এক সরকারী শুভেচ্ছা মিশনের সঙ্গে ঘুরে এসেছি চীন ও আমেরিকা। খবরের কাগজে সে সব রিপোর্ট হয়তো পাঠ ক'রে থাকবে। কিন্তু এতেও স্বস্তি নেই, শ্রীমন্ত। আমাকে কে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কতো চেষ্টা করেছি তার নাগাল আমি কিছুতেই পাইনি। তাই চলেছি ভারতবর্ষের বাইরে, দূর প্রাচ্য ভ্রমণে। শিল্পীর নাকি কোনো জাত নেই, তার নাকি কোনো সমাজ নেই, সে নাকি সব কিছুর উর্ধ্বে: তাই না, শ্রীমন্ত?'

শেষ পেগটা শেষ ক'রে বিভাস চুপ করল। বুঝি একটু হাসল। হাসি নয় যেন কান্না। মনে হল, এই হাসি কান্না দিয়েই সে তার গোটা

জীবনটা ভরিয়ে রেখেছে। আমি ওর জীবনের যতটুকু জানতাম, মনে হল, তার চেয়েও রক্তাক্ত ওর বর্তমান জীবন। চুপ ক'রে শুনে গেলাম ওর কাহিনী, কোনো কথা বলতে পারলাম না।

দেখলাম, ক্লান্তভাবে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে বিভাস। তার মুখে এসে পড়েছে ভোরবেলার আলো। কী করুণ, কী বিষণ্ণ ওর মুখখানা! মানবাত্মার নিগূঢ় কোনো বেদনা যদি থাকে তা-ই যেন ফুটে উঠেছে ওর সারা মুখে। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনে বঞ্চনা ও প্রত্যাশা, ছায়া আর আলো, সন্ধ্যা ও প্রভাতের সম্মিলিত রাগ রূপ যেন ওর মুখখানি। মানুষের মুখের উপর আত্মার আলো এমন ক'রে আমি আর কখনো দেখিনি।

আমি মৃদুস্বরে বললাম, 'বিভাস, ভোর হয়ে গেছে। তুমি বিশ্রাম করো। আমি চলি ভাই।'

'এখন বাড়ী ফিরবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা এসো।'

বেরিয়ে আসছি ঘর থেকে, গঙ্গাধর ঢুকল: 'বাবু' এক ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'বলগে, দেখা হবে না।'

তার কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রমহিলা ভিতরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে আমি চমকে গেলাম। বিভাসের টেবিলে ফ্রেমে আঁটা যে ছবি খানি রয়েছে তার মুখের সঙ্গে এই ভদ্রমহিলার মুখের আশ্চর্য শুধু তফাৎ এই এঁর মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে।

'আজ আমি ফিরে যাব বলে অসিনি বিভাস!

ভদ্রমহিলার গলা কী শান্ত কী সংযত।

'পূরবী! তুমি!—'

বিস্ময়ে বিভাস সোজা হ'য়ে দাঁড়াল।

'গতকাল রাত্রে তোমার সেতারের অনুষ্ঠান শুনে আজ ভোরেই তোমার কাছে ছুটে আসতে হল। তোমাকে আরো বড়ো হতে হবে, বিভাস। তাই, না এসে থাকতে পারলাম না।'

'এই ঘরে তোমাকে কোথায় বসতে দেব, পূরবী ?'

পূরবী দেবী হাসলেন, ভারি সুন্দর সে-হাসি : 'তোমার আসন তো আমি পেয়ে গেছি। সে তোমার অন্তর। এবার তোমার আসল জায়গাটুকু আমি ঠিক করে দোব। তাহলেই তোমার সকল জ্বালা জুড়োবে, সকল সংশয় ঘুচবে।'

পূরবী দেবী এগিয়ে গেলেন বিভাসের কাছে।

...আমি নামতে লাগলাম সিঁড়ি দিয়ে।

'সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক্—'

সেই ভোরে বিভাসের বাড়ি থেকে চলে আসতে আসতে এই প্রার্থনাই আমি করেছিলাম।

শেষ

